চিঠিপত্র ১॥ পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত

চিঠিপত্র ২॥ জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

চিঠিপত্র ৩॥ পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৪॥ কন্যা মাধুরীলতা দেবী, মীরা দেবী, দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ, দৌহিত্রী নন্দিতা ও পৌত্রী নন্দিনীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৫॥ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী ও প্রমথনাথ চৌধুরীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৬॥ জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুকে লিখিত

চিঠিপত্র ৭॥ কাদম্বিনী দেবী ও নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত

চিঠিপত্র ৮॥ প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত

চিঠিপত্র ৯॥ হেমন্তবালা দেবী এবং তাঁর পুত্র, কন্যা, জামাতা, ভ্রাতা ও দৌহিত্রকে লিখিত

চিঠিপত্র ১০॥ দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিত

চিঠিপত্র ১১॥ অমিয় চক্রবর্তীর মাতা অনিন্দিতা দেবী এবং অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত

চিঠিপত্র ১২॥ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর পরিবারবর্গকে লিখিত

চিঠিপত্র ১৩॥ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুঞ্জলাল ঘোষকে লিখিত

চিঠিপত্র ১৪॥ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত

চিঠিপত্র ১৫॥ যদুনাথ সরকার ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখিত

চিঠিপত্র ১৬॥ জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সমর সেনকে লিখিত

চিঠিপত্র ১৭॥ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ও মীরা চৌধুরীকে লিখিত

ছিন্নপত্র ॥ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও ইন্দিরাদেবীকে লিখিত

ছিন্নপত্রাবলী ॥ ইন্দিরাদেবীকে লিখিত পত্রাবলীর পূর্ণতর সংস্করণ

পথে ও পথের প্রান্তে ॥ নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত

ভানুসিংহের পত্রাবলী ॥ শ্রীমতী রানু দেবীকে লিখিত

সকালে চায়ের টেবিলে

সপ্তদশ খণ্ড

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলকাতা

চিঠিপত্র ॥ সপ্তদশ খণ্ড

দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র এবং তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা মীরা চৌধুরীকে লিখিত
রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

প্রকাশ : মাঘ, ১৪০৪

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় কর্তৃক সম্পাদিত

ISBN-81-7522-157-7 (V.17)
ISBN-81-7522-025-2 (Set)

প্রকাশক শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায়
বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলকাতা ১৭

মুদ্রাকর শ্রীঅরুণকুমার দে
র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন। ৪৩ বেনিয়াটোলা লেন। কলকাতা ৯

ভূমিকা

কলকাতার মেয়ো হাসপাতালের রেসিডেন্ট সার্জন, বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট সুহৃদবর্গের অন্যতম ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের অনেক চিঠি আছে।

ডাক্তার মৈত্র সার্জন বা শল্য চিকিৎসক হলেও সব রকমের রোগের চিকিৎসায় দক্ষ ছিলেন। বিশেষ পারদর্শী ছিলেন চক্ষুরোগের চিকিৎসায়। এজন্য তিনি মেয়ো হাসপাতালের বাইরে চক্ষু চিকিৎসার জন্য একটা নার্সিং হোমও করেছিলেন।

অনেকেই জানেন রবীন্দ্রনাথ নিজেও একজন ভালো চিকিৎসক ছিলেন। তিনি হোমিওপ্যাথি ও বায়োকেমিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতেন। ছোটোখাটো রোগ ছাড়াও অনেকের অনেক কঠিন কঠিন অসুখও তিনি অনায়াসেই সারিয়ে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ যেসব রোগীর রোগকে নিজের চিকিৎসার আয়ত্তের বাইরে বলে ভাবতেন, সেইসব রোগীকে প্রায়ই ডাক্তার মৈত্রের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। রোগীদের পাঠাবার সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁদের হাতে একটি করে চিঠি লিখে দিতেন। দ্বিজেনবাবু সেইসব চিঠি সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। সেই চিঠিগুলি থেকে রবীন্দ্রনাথের অপরের জন্য অত্যন্ত দরদি মনোভাবের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

অপর অনেকগুলি চিঠিতে দ্বিজেনবাবুর সমাজ সেবামূলক কাজে রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতার এবং রবীন্দ্রনাথেরও কাজে দ্বিজেনবাবুর সমর্থনের পরিচয় রয়েছে। কোনো কোনো চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের খবরও আছে।

কথা ছিল, ১৯১২ সালের মার্চ মাসে রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেনবাবু উভয়ে একসঙ্গে বিলাত যাবেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে রবীন্দ্রনাথ তখন বিলাত যেতে পারেন নি।

রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য শিলাইদহ যান। সেখানে গিয়ে অবসর সময়ে কীভাবে গীতাঞ্জলি প্রভৃতি বইয়ের কবিতার ইংরাজি অনুবাদ করতেন, তারপর সুস্থ হয়ে আবার কবে বিলাত গেলেন, সেখান থেকে কবে আমেরিকা যান — সেসব কথা এবং আরও নানা প্রসঙ্গে নানা কথা লেখা আছে দ্বিজেনবাবুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলিতে।

রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেনবাবু এক সঙ্গে বিলাত যেতে না পারলেও, ক'মাস পরে রবীন্দ্রনাথ যখন পুত্র ও পুত্রবধূসহ বিলাত যান, তখন দ্বিজেনবাবু সেখানে কবির সঙ্গে মিলিত হন। এবং পরে কবি যখন আবার ইংলন্ড থেকে আমেরিকা যান, তখন দ্বিজেনবাবু কবির আমেরিকা যাত্রাপথে সঙ্গী হয়েছিলেন।

এই গ্রন্থে দ্বিজেনবাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা মীরা চৌধুরীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠিও দিয়েছি।

আর দিয়েছি, দ্বিজেনবাবু ও মীরা দেবীর অটোগ্রাফের খাতায় লিখে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের কবিতা ক'টি এবং দ্বিজেনবাবুর কনিষ্ঠা কন্যা ইন্দিরা দেবীর বিবাহ উপলক্ষে লেখা রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী কবিতাটিও।

চিঠি এবং চিঠির প্রসঙ্গ-কথা সবদিক থেকেই বইটিকে নির্ভুল ও তথ্য-সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। তবুও কোথাও যদি সামান্যতমও ত্রুটি থেকে থাকে, কোনো রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ তা জানালে কৃতজ্ঞ থাক্‌ব।

দ্বিজেনবাবুকে লেখা চিঠি ইত্যাদি তাঁর পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের কাছে এবং মীরা দেবীকে লেখা চিঠি ও কবিতা তাঁর কাছেই পেয়েছি।

বিশ্বভারতীর উপাচার্য ড. দিলীপকুমার সিংহ এবং শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ শ্রীস্বপন মজুমদারের বিশেষ আগ্রহে বিশ্বভারতীর গ্রন্থনবিভাগ থেকে বইটি প্রকাশিত হ'ল।

এঁদের সকলকে অশেষ ধন্যবাদ।

১.১.১৯৯৮ **গোপালচন্দ্র রায়**

দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে লিখিত

১

২৯ নভেম্বর ১৯০৬

জোড়াসাঁকো
কলিকাতা

ওঁ

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পায়ে অকস্মাৎ ক্ষত হইয়া দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠিয়াছে, এইজন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। আপনার চিকিৎসাধীনে থাকিলে তাঁহার উপকার হইবে এবং যত্ন ও শুশ্রূষার ত্রুটি হইবে না নিশ্চয় জানি। এই কারণে তাঁহাকে মেয়ো হাঁসপাতালে আশ্রয় লইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। পূর্ব্বেও আপনার সহৃদয়তার পরিচয় পাইয়াছি, এইজন্য পুনশ্চ আপনাকে আমার বন্ধুর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিলাম। ইনি অল্পেই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন, বিশেষত এই পা লইয়া ইঁহাকে দীর্ঘকাল দুঃখ ভোগ করিতে হইল বলিয়া ইনি হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। আপনার নিকট হইতে যত্ন ও আশ্বাস পাইলে ইঁহার মনে বল-সঞ্চার হইতে পারিবে এবং আরোগ্যও সহজ হইয়া উঠিবে, এই আশা করিয়া আপনার হস্তে ইঁহাকে সমর্পণ করিতেছি—ইঁহার ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত করিবেন। ইতি ১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩১৩

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন শান্তিনিকেতনে প্রথম যুগের বিদ্যালয়ের একজন প্রধান শিক্ষক। এঁরই সময়ে রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ এখান থেকে

এনট্রান্স পাস করেন। মনোরঞ্জনবাবুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের অনেক চিঠি আছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর মনোরঞ্জনবাবু সে-সব নিয়ে 'স্মৃতি' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সেই গ্রন্থের সব শেষে দ্বিজেনবাবুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিটি আছে।

মনোরঞ্জনবাবুর গ্রন্থে এই চিঠি থাকায় বোঝা যাচ্ছে—রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেনবাবুকে লেখা চিঠি মনোরঞ্জনবাবুর হাত দিয়ে দেবার জন্য দিলেও মনোরঞ্জনবাবু চিঠিটি নিয়ে দ্বিজেনবাবুর কাছে যান নি। রবীন্দ্রনাথের ওই চিঠি নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিলেন।

২

২৭ এপ্রিল ১৯১০ জোড়াসাঁকো

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

পত্রবাহকের সহিত একটি অন্ধ ভদ্রলোককে আপনার নিকট পাঠাইতেছি। ইনি সম্পূর্ণ নিঃসহায়। দৈবদুর্ব্বিপাকে ঘুরিতে ঘুরিতে আমাদের আশ্রমে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। সেখান হইতে চক্ষুর চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। আপনি দয়া করিয়া আপনাদের হাঁসপাতালে রাখিয়া যদি ইঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দেন, তবে এই হতভাগ্যের বিশেষ উপকার করা হইবে।

আমার নববর্ষের সাদর অভিবাদন গ্রহণ করিবেন। ইতি ১৪ই বৈশাখ ১৩১৭

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

১৮ মে ১৯১০

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বিনয় সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন

আমার ভৃত্যটি আপনার চিকিৎসায় ও যত্নে সঙ্কটাপন্ন পীড়া হইতে রক্ষা পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে—আপনি আমার সকৃতজ্ঞ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

ওঁ

প্রিয়বরেষু

পত্রবাহকটি আমার বাহন উমাচরণের দাদা—প্লীহা প্রভৃতি অন্তরিন্দ্রিয়গুলি বিস্তীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ রোগী কি আপনাদের হাঁসপাতালে আশ্রয়যোগ্য ?

কাল জামাইষষ্ঠীর খাওয়া হজম করিয়াছেন ত ?

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এন্ট্রান্স পাস করেন। মনোরঞ্জনবাবুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের অনেক চিঠি আছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর মনোরঞ্জনবাবু সে-সব নিয়ে 'স্মৃতি' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সেই গ্রন্থের সব শেষে দ্বিজেনবাবুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিটি আছে।

মনোরঞ্জনবাবুর গ্রন্থে এই চিঠি থাকায় বোঝা যাচ্ছে—রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেনবাবুকে লেখা চিঠি মনোরঞ্জনবাবুর হাত দিয়ে দেবার জন্য দিলেও মনোরঞ্জনবাবু চিঠিটি নিয়ে দ্বিজেনবাবুর কাছে যান নি। রবীন্দ্রনাথের ওই চিঠি নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিলেন।

২

২৭ এপ্রিল ১৯১০ জোড়াসাঁকো

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

পত্রবাহকের সহিত একটি অন্ধ ভদ্রলোককে আপনার নিকট পাঠাইতেছি। ইনি সম্পূর্ণ নিঃসহায়। দৈবদুর্ব্বিপাকে ঘুরিতে ঘুরিতে আমাদের আশ্রমে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। সেখান হইতে চক্ষুর চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। আপনি দয়া করিয়া আপনাদের হাঁসপাতালে রাখিয়া যদি ইঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দেন, তবে এই হতভাগ্যের বিশেষ উপকার করা হইবে।

আমার নববর্ষের সাদর অভিবাদন গ্রহণ করিবেন। ইতি ১৪ই বৈশাখ ১৩১৭

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

১৮ মে ১৯১০

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বিনয় সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন

আমার ভৃত্যটি আপনার চিকিৎসায় ও যত্নে সঙ্কটাপন্ন পীড়া হইতে রক্ষা পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে—আপনি আমার সকৃতজ্ঞ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

ওঁ

প্রিয়বরেষু

পত্রবাহকটি আমার বাহন উমাচরণের দাদা—প্লীহা প্রভৃতি অন্তরিন্দ্রিয়গুলি বিস্তীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ রোগী কি আপনাদের হাঁসপাতালে আশ্রয়যোগ্য ?

কাল জামাইষষ্ঠীর খাওয়া হজম করিয়াছেন ত ?

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

২১ নভেম্বর ১৯১০ শিলাইদা

নদিয়া

ওঁ

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

পত্রবাহক শ্রীযুক্ত আশুতোষ মজুমদার আমাদের একজন দরিদ্র ভদ্র প্রজা। তাহার বালিকা কন্যাটির হাত ভাঙিয়া গিয়া স্থানীয় ডাক্তারের প্রসাদে ঠিক মত জোড়া লাগে নাই। ইহাকে আপনারই আশ্রয়ে পাঠাইতেছি। জানি আপনি যত্ন করিয়া দয়ার সহিত চিকিৎসা করিবেন। বালিকার পিতার ইচ্ছা রোগীর সঙ্গে সেও হাঁসপাতালের মধ্যে স্থান পায়। কারণ, তাহার কন্যার বয়স অল্প—সে একলা থাকিতে ভয় পাইবে—যদি নিয়মবিরুদ্ধ না হয়, তবে এ সম্বন্ধেও তাহাকে দয়া করিবেন। ইতি ৫ই অগ্রহায়ণ ১৩১৭

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

৭ জুন ১৯১১ শিলাইদা

নদিয়া

ওঁ

প্রিয়বরেষু

পত্রবাহক ম্যালেরিয়া রোগে জীর্ণ—আপনার হাঁসপাতালে আশ্রয় দিতে পারিবেন? পাড়াগাঁয়ের ছেলে—কিছুদিন আমাদের বিদ্যালয়ে ফ্রি পড়িয়াছিল।

ছুটিতে শিলাইদহে যাপন করিতেছি। ছুটি অন্তে কলিকাতায় গিয়া আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। ইতি ২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

১৯ ডিসেম্বর ১৯১১ জোড়াসাঁকো

City line ত বেশ ভাল ঠেকিতেছে। ঠিক করিয়া ফেলিবেন। কাল ভোরে পদ্মায় চলিলাম। রাত্রে এগারোটার মধ্যে আসিলে আমাকে বিছানার বাহিরে পাইবেন।

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিজেনবাবুকে লেখা এই চিঠিটুকুর একটা বিস্তৃত ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস হ'ল—

১৯৩১ সালে রবীন্দ্রনাথের ৭০তম জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে দেশবাসী কলকাতায় টাউন হলে এক সুন্দর মনোরম ও জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে তাঁকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জানায়। সভার উদ্যোক্তারা সেই সময় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রবীন্দ্র-বিষয়ক বিভিন্ন রচনা নিয়ে 'জয়ন্তী উৎসর্গ' নামে একটি স্মারক গ্রন্থও প্রকাশ করেছিলেন। ওই স্মারক গ্রন্থে 'রবীন্দ্র সংসর্গে' নামে একটি প্রবন্ধ দ্বিজেনবাবু লিখেছিলেন। তাতে তিনি লেখেন—

'১৯১২ সালের কথা—১৯ বৎসর পূর্বে। তখন আমি মেয়ো হস্পিটালের

রেসিডেন্ট সার্জন। গঙ্গার ধারেই হাসপাতাল। তার বিশাল ভবনের বিরাট ছাদের উপর কবির সঙ্গে মাঝে মাঝে গান আবৃত্তি ও আলোচনায় সঙ্গত্ খুব জম্‌তো। অনেকেই আসতেন। একদিন ছাদের কোণে বেদীতে বসে কবির সঙ্গে কথা হচ্ছিল, কি ক'রে দেশকে গ'ড়ে তোলা যায়। কথায় কথায় সমবায় পদ্ধতির কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে তিনি ডেনমার্কের অপূর্ব সমবায় বিজ্ঞানমূলক সর্বাঙ্গীণ উন্নতির কথা পাড়লেন। হঠাৎ বোধ হয় আমিই বলে বসলাম—একবার গিয়ে সাক্ষাৎভাবে দেখে আসলে হয় না! আর সেই যাত্রায় ইউরোপের অধুনাতম অস্ত্র চিকিৎসা প্রণালীর একটা প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে আসি।

কবি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন—বেশ ত চল না এক সঙ্গে যাওয়া যাবে। তার পরদিনই ছুটি পাবার সম্ভাবনা বুঝে নিয়ে City of Paris জাহাজে পাড়ি দেওয়া স্থির করলাম।'

দ্বিজেনবাবু যে লিখেছেন—City of Paris জাহাজে পাড়ি দেওয়া স্থির করলাম, এই স্থির করার আগে কলকাতার বিভিন্ন জাহাজ কোম্পানির অফিসে গিয়ে জাহাজের ভাড়া ইত্যাদি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে সেসব কথা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন

Mayo Hospital
19.12.11

শ্রীচরণেষু

সময়াভাবে আজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বা আপনার কন্যার খবর নিজে যাইয়া লইতে পারিলাম না। আশা করি তিনি ভাল আছেন।

আপনি কবে বোলপুর যাইবেন ? আমি আজ Nippon Yusen Kaisha-র অফিসে যাইয়া খবর লইলাম; তাহাদের 2nd class একেবারে পিছনে, 1st class from Colombo to Marseilles ই ৬৫০্; তাহার উপর India ও Europe এর railway fare যোগ করিলে মোট ৭০০্ বা ৮০০্ কেবল Single fare-এ পড়ে। আমার মনে হয় তাহার অপেক্ষা City Line এর 1st class ভাল হইবে—City of Paris (9000) নাকি 'Splendid boat', City of Lahore (7000) নূতন জাহাজও খুব up-to-date, তাদের Colombo

to Marseilles ৫২৭৲ বা ৫৪০৲। আমরা কলিকাতা হইতে directও যাইতে পারি। 'Anchor' বা 'Bibby' অপেক্ষা City ভাল হইবেই। আপনার এ বিষয়ে অভিমত জানিতে পারিলে আমি যত শীঘ্র পারি berth reserve করিবার চেষ্টা করি।

আপনার স্নেহাকাঙ্ক্ষী
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র

যদি আপনার অসুবিধা না হয় আমি আজ রাত্রে যাইয়া আপনার সহিত দেখা করিতে পারি—৯টা আন্দাজ রাত হইতে পারে।

দ্বিজেনবাবু এই চিঠিটি লিখে তাঁর অনুগত কারও হাত দিয়ে জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেনবাবুর চিঠি পড়ে সেই চিঠির উপরেই তাঁর বক্তব্য ওই কথা লিখে জানিয়ে পত্রবাহকের হাতে দিয়ে দেন।

৮

২৬ ডিসেম্বর ১৯১১ কলিকাতা

ওঁ

প্রিয়বরেষু

কাল রাত্রে আসিয়াছি। আবার কখন কোথায় দৌড় মারি তাহার ঠিকানা নাই। ইতিমধ্যে আমাদের খেয়াতরীর খবরটি জানিয়া লইতে চাই। পাড়ি দিবার আয়োজন কতদূর অগ্রসর হইল? ইতি ১০ই পৌষ ১৩১৮

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯

ওঁ

প্রিয়বরেষু

একটা মৃদু রকমের গুজব শুনা যায় যে আপনি অবশেষে হয়ত সস্ত্রীক যাত্রা করিবেন। এই সুসংবাদ যদি সত্য হয় তবে আগে থাকিতে আমাদিগকে জানাইতে দোষ কি? সময় থাকিতে আমার একটু জানিবার প্রয়োজন আছে—কারণ, যদি আপনার স্ত্রী যান তবে বৌমাকেও সঙ্গে লইব এইরূপ কথা চলিতেছে। কাল মধ্যাহ্নের গাড়িতে বোলপুর যাত্রা করিব। ইতি রবিবার

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিজেনবাবু রবীন্দ্রনাথের এই চিঠির কি উত্তর দিয়েছিলেন, সে চিঠি না পাওয়ায়, তা জানা গেল না। দ্বিজেনবাবু সস্ত্রীক যাবেন না, হয়তো এই কথাই জানিয়েছিলেন।

১০

১৫ জানুয়ারি ১৯১২

Patisarh
Atrai
N.B.S.R.

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আর একটি দরিদ্র রোগীকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিতেছি। লোকটি নয় টাকা বেতনের কর্ম্মচারী কিন্তু বেচারার চোখ দুটির দাম নিশ্চয়ই তাহার চেয়ে অনেক বেশি। দেখিবেন, যদি কোনো উপায়ে ইহার দৃষ্টিকে উদ্ধার করিতে পারেন।

আমি এক দূর পল্লীগ্রামে অতি ছোট্ট নদীর এক প্রান্তে[১] বোট লইয়া বসিয়া আছি। আপনারা ১২ই মাঘে আমার ঘাড়ে এক বক্তৃতার বোঝা ফেলিয়া দিয়াছেন—তার উপরে ১১ই মাঘের[২] দুই বেলা আছে—এদিকে আবার কাজকর্ম্মের উৎপাতও কামাই যাইতেছে না। কেমন করিয়া সকল দিক রক্ষা হইবে তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না। ডাক্তার আচার্য[৩] জানিতে চাহিয়াছিলেন আমার বক্তৃতার বিষয়টি কি? আপনি বলিবেন বিষয়টি 'ধর্মের অধিকার'।

এবার ৫, ৬ দিন কলকাতায় ছিলাম রোজ ভাবিতাম আপনাকে একবার দেখা দিয়া আসিব কিন্তু দুই পক্ষ এক জায়গায় উপস্থিত হইতে না পারিলে দেখা দেওয়া অসম্ভব হয়—আপনি ঘরে আছেন কিনা এ সন্দেহ কিছুতেই মিটিত না—তাই আপনাদের পথের গোরুর গাড়ির ব্যূহ ভেদ[৪] করিয়া যাত্রা করিতে সাহস হইত না। ইতি ১লা মাঘ ১৩১৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. উত্তরবঙ্গের রাজসাহী জেলায় (বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশ-এর অন্তর্ভুক্ত) পতিসরে ছিল রবীন্দ্রনাথদের জমিদারি। রবীন্দ্রনাথ এই সময় তাঁদের জমিদারি দেখাশুনা করতেন। পতিসর ছোটো নাগর নদীর তীরে অবস্থিত। রবীন্দ্রনাথ প্রধানত তাঁদের 'পদ্মা' বোটে করেই জমিদারিতে যাতায়াত করতেন।

২. ১১ই মাঘ ব্রাহ্মসমাজের একটা উৎসবের দিন। ১২৩৬ সালের ১১ই মাঘ (ইং ২৩ জানুয়ারি ১৮৩০) তারিখে ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব ভবনের (৫৫নং আপার চিৎপুর রোডে) দ্বারোদ্ঘাটন হয়েছিল। তাই ওই দিন ব্রাহ্মদের 'মাঘোৎসব'।

৩. ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য। আদি ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম নেতা ছিলেন।

৪. দ্বিজেনবাবু ছিলেন কলকাতায় বড়োবাজারে পোস্তায় গঙ্গাতীরে অবস্থিত মেয়ো হাসপাতালের রেসিডেন্ট সার্জন। পোস্তা বরাবরই মসলা ইত্যাদি দ্রব্যের পাইকারি দোকানের আড়ত। দূর দূর অঞ্চলের ছোটো ছোটো দোকানদাররা গরুর গাড়িতে করে এই পোস্তা থেকে ওই মসলা ইত্যাদি কিনে নিয়ে যেত। এজন্য এখন এখানে যেমন ওই মসলা ইত্যাদি নিয়ে যাওয়ার জন্য লরীর ভিড়, আগে ছিল গরুর গাড়ির ভিড়।

১১

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯১২ জোড়াসাঁকো

ওঁ

কোনো প্রকারে আজ পর্য্যন্ত ছিলাম। কাল বুধবার মধ্যাহ্নের গাড়িতে বোলপুরে দৌড় দিতে হইবে। ফিরিয়া আসি তাহার পর সুযোগ ঘটিবে।[১]

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. ৬.২.১২ তারিখে দ্বিজেনবাবু লোক মারফৎ রবীন্দ্রনাথকে এই চিঠিটি দিয়েছিলেন—

Mayo Hospital

Calcutta 6, Feb. 1912

শ্রীচরণেষু,

আপনি এখানে কি বোলপুরে জানি না। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কি থাকিবেন? আমার দিদির ও বিজয়বাবুর বিশেষ ইচ্ছা যে আপনারা যদি একদিন—এর মধ্যে তাদের বাগানে (Zooতে) বাড়ীর সকলকে নিয়ে যান। একবার ত

সে রকম কথা হয়েছিল না? বৃহস্পতিবার বিকালে হলেই বেশ হয়। আশা করি সকলে ভাল আছেন।

আপনার স্নেহের
দ্বিজেন

রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেনবাবুর এই চিঠি পেয়ে তখন এই চিঠির উপরেই এক পাশে ওই কথা ক'টি লিখেছিলেন।

দ্বিজেনবাবুর চিঠির বিজয়বাবু হলেন বিজয়কৃষ্ণ বসু। তিনি ছিলেন দ্বিজেনবাবুর ভগ্নীপতি। বিজয়বাবু ওই সময় কলকাতার চিড়িয়াখানা বা জু গার্ডেনের সুপারিনটেন্‌ডেন্ট ছিলেন এবং সপরিবারে জু গার্ডেনে পাওয়া কোয়ার্টারে থাকতেন। রবীন্দ্রনাথ পরে কখনো বিজয়বাবুদের জু গার্ডেনের বাসায় গিয়েছিলেন কি না জানি না। তবে এই বিজয়বাবুর জু গার্ডেনের বাসা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরই অন্য একটা কথা মনে আসছে। সেটা বলছি—

বিজয়বাবু যেমন ছিলেন দ্বিজেনবাবুর ভগ্নীপতি, তেমনি রবীন্দ্রনাথের আর এক স্নেহভাজন ঐতিহাসিক ডক্টর কালিদাস নাগের ছিলেন মামা। কালিদাসবাবু ছাত্রজীবনেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন। এম. এ. পাস করে কালিদাসবাবু একবার শান্তিনিকেতনে যান। শান্তিনিকেতন থেকে চলে আসবার সময় কালিদাসবাবু কবিকে প্রণাম করতে গেলে, কবি বললেন—তোমার ঠিকানাটা কি? দিয়ে যাও তো। জেনে রাখা ভালো।

কালিদাসবাবু ওই সময় তাঁর মামার কাছে থাকতেন। তিনি মামার নাম ও তাঁর জু গার্ডেনের ঠিকানা বললেন। আরও বললেন—প্রয়োজন হলে মামার প্রযত্নেই আমাকে চিঠি দেবেন।

কয়েকদিন পরে কবির কাছ থেকে কালিদাসবাবুর নামে এক চিঠি এল। ঠিকানার ঘরে কবি লিখেছেন—Sri Kalidas Nag
C/o Bijoykrishna Bose
Zoo Garden
(Human Section)

১২
৭ মার্চ ১৯১২

শিলাইদা
নদিয়া

ওঁ

প্রীতিনমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন

দেবলকে[১] আমার সঙ্গে লওয়াই স্থির করিয়াছি। Servants' class জিনিষটা কি রকম সন্ধান লইবেন। আশা করি এখনো জায়গা পাওয়া যাইবে। যদি জায়গা থাকে তবে হয়ত দুজন আমাদের সঙ্গে যাইতে পারে। আহার ব্যবহারের ব্যবস্থাটি কিরূপ একটু বিস্তারিতভাবে জানিয়া লওয়া ভাল—নহিলে সমুদ্রে লইয়া গিয়া দুটো ছেলেকে[২] একেবারে জলাঞ্জলি দেওয়া হইবে। যাত্রার সময় ত আসন্ন হইয়া আসিল—সঙ্কল্প ত স্থির আছে, ঘরের দিকে তাকাইয়া মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে পরিতাপের উদয় হইতেছে না ত? দেখিবেন শেষ কালে একলা দ্বীপান্তরিত করিবেন না। আগামী সোমবারে চাটগাঁ মেলে সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। ইতি ২৪শে ফাল্গুন ১৩১৮

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. এই চিঠির দেবল হলেন তখনকার শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের একজন খ্যাতিমান অবাঙালি ছাত্র। দেবল ছিলেন ধনীর সন্তান। তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লন্ডনে গিয়ে সেখানে পড়াশুনা করবেন স্থির করেছিলেন।

শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের ছাত্র, পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও বিশ্বভারতীর উপাচার্য সুধীরঞ্জন দাশ তাঁর 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে এই দেবল সম্বন্ধে লিখেছেন, 'আমি [শান্তিনিকেতনে] যাবার দিন দুই তিন আগে এসেছিলেন একটি ছিপছিপে রোগা ধপধপে রঙের ছেলে। নাম তার নারায়ণ কাশীনাথ দেবল। শুনেছিলাম তাঁর বাবা ছিলেন মহারাষ্ট্রীয়,

মা ছিলেন ব্রহ্মদেশীয়, চমৎকার হাসিখুশি ছেলে ছিলেন তিনি। সিল্কের লুঙ্গির উপর বেঁটে কোট গায়ে দিয়ে মাথায় সিল্কের রুমাল বাঁধলে খুব মানানসই দেখাতো। বয়সে আমার চেয়ে বছর খানেকের বড়ো ছিলেন, কিন্তু স্বভাবে ছিলেন অত্যন্ত ছেলেমানুষ। দেবলদা পড়তেন আমাদের এক ক্লাস উপরে।'

২. রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিতে দুটো ছেলে বলে দেবল ছাড়া আর এক জনের কথা বলেছেন, এই ছেলেটি কে তা ঠিক জানা যাচ্ছে না। তবে মনে হয় ইনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ত্রিপুরার মহারাজার সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ কর্ণেল মহিম ঠাকুর বা মহিমচন্দ্র দেববর্মণেব পুত্র সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মণ।

১৯ শে মার্চ রবীন্দ্রনাথের বিদেশ যাত্রা পণ্ড হওয়ায় তখন দেবল গিয়েছিলেন কি না সঠিক জানা যায় নি। তবে সোমেন্দ্র যান নি। ক'মাস পরে রবীন্দ্রনাথ যখন পুত্র, পুত্রবধূসহ লন্ডন যান সেবার তাঁদের সঙ্গে সোমেন্দ্রচন্দ্র গিয়েছিলেন। সোমেন্দ্র কবির সঙ্গে লন্ডন গিয়ে সেখান থেকে আমেরিকা যান এবং সেখানে পড়াশুনা করেছিলেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—'১৬ই জুন [১৯১২] রবীন্দ্রনাথ পুত্র ও পুত্রবধূসহ ডোভার হইয়া লন্ডন পৌঁছিলেন। ...তখন সেখানে ...কালীমোহন ঘোষ, নারায়ণ কাশীনাথ দেবল, অরবিন্দমোহন বসু, সুকুমার রায়চৌধুরী (তাতাবাবু), কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় (বুবা) প্রভৃতি কবির বিশেষ পরিচিত স্নেহের পাত্র—সকলেই রবীন্দ্র-অনুরাগী।' রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড—৪র্থ সংস্করণ, পৃ: ৩৮৭

প্রভাতবাবুর এই লেখা থেকে জানা যাচ্ছে—দেবল হয় দ্বিজেনবাবুর সঙ্গে, নয়তো এরপরে রবীন্দ্রনাথ ইংলন্ড যাওয়ার আগে—ইংলন্ডে গিয়েছিলেন।

'জয়ন্তী উৎসর্গ' গ্রন্থে দ্বিজেনবাবুর লেখা 'রবীন্দ্র-সংস্পর্শে' প্রবন্ধ থেকে জানা যায়—বিলাত যাওয়ার জন্য জাহাজে রবীন্দ্রনাথের বাক্স পেটরা এসে গেলেও বাড়ি থেকে বেরোবার পূর্ব মুহূর্তে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর তখনকার বিলাত যাত্রা স্থগিত হয়ে যায়।

দ্বিজেনবাবু তাঁর ওই প্রবন্ধে লিখেছেন—গোটা কেবিনে একা রাজত্ব করে তাঁর বাক্স পেটরা নিয়ে চললুম আমি একলা।

এবার রবীন্দ্রনাথের বাক্স পেটরা সঙ্গে নিয়ে জাহাজে দ্বিজেনবাবুর যাওয়ার কথাটা। বাক্স পেটরা নিয়ে দ্বিজেনবাবু কতদূর গিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে তাঁর

নিজের লেখা থেকে বা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী থেকেও কিছু জানা যায় না। তবে ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের 'টেগোর বার্থ সেন্টিনারি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হয়, তাতে লেখা আছে—

'... Suddenly falls ill on the night before his departure (March 1912) and has to postpone his visit, his luggage going as far as Madras.'

বাক্স পেটরা মাদ্রাজ পর্যন্তই গিয়েছিল। এ সম্পর্কে দ্বিজেনবাবুকে লেখা রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তখনকার দুটি চিঠি পাওয়া গেছে। তা থেকেও জানা যায় কবির বাক্স পেটরা মাদ্রাজ পর্যন্তই গিয়েছিল। চিঠি দুটি এখানে উদ্ধৃত করছি—

জোড়াসাঁকো
মঙ্গলবার

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আজ সকাল বেলায় বাবার যাবার সমস্ত ঠিক এমন কি কাপড় ছেড়ে প্রস্তুত হয়েছেন—এমন সময় এমনি একটি nervous attack হ'ল যে আর যেতে পারলেন না। কলকাতায় এসে অবধি যে রকম strainএর উপর দিয়ে যাচ্ছিল তাতে এ রকম একটা breakdown হওয়া কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়। এত মাথা ঘোরা ও nausea যে সমস্ত দিন মাথা তুলতে পারেন নি—আর এর মধ্যে ভয়ানক weak হয়ে পড়েছেন। ডাক্তাররা প্রথমে আশঙ্কা করেছিলেন যে হয়ত brain attack করেছে—কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে তা নয়। বিকেলের দিকে ক্রমশ একটু সুস্থ হলেন। আমাকে সকালে ডাক্তার ডাকতে এত ঘোরাঘুরি করতে হয়েছিল যে আপনাকে গিয়ে ঘাটে খবর দিয়ে আসতেও সময় পাইনি। আপনি নিশ্চয়ই খুব disappointed হয়ে গেছেন। বাবার যাবার এখনও কিছুই স্থির করতে পারিনি। ডাক্তাররা বলেছেন অন্ততপক্ষে এক সপ্তাহ কিংবা ১৫ দিন perfect rest দরকার, তারপরে যাবার কথা ভাবা যেতে পারে। আমি সেই জন্যে আজ King Hamilton-দের ওখানে

গিয়ে বলে এসেছি ওঁর passageটা পরে অন্য কোনও জাহাজে transfer করে দিতে। সম্ভবত City of London জাহাজ যেটা এক মাস পরে ছাড়বে—সেটায় যেতে পারবেন। জিনিষপত্র ফেরৎ পাঠাবার জন্যে Captainকে টেলিগ্রাফ করিয়ে দিলুম। আপনি যদি একটু দেখে দেন যে ঠিক জিনিষগুলো দিচ্ছে কিনা তাহলে বাধিত হব। জিনিষগুলো মাদ্রাজ থেকে পার্শেলে পাঠিয়ে দেবার জন্যে instruction দিয়েছি...।

ইতি—

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনাকে একটা চিঠি মাদ্রাজে লিখেছি—কিন্তু সেটা যদি না পান তাই আর একখানা Colomboতে লিখছি।

বাবার আজ সকালে হঠাৎ nervous breakdown এর মতো হওয়াতে যেতে পারলেন না। ...ডাক্তাররা বলছেন এখন অন্তত কিছুদিন perfect rest দরকার ...

জিনিষগুলো ফেরৎ পাঠাবার জন্য কাপ্তেনকে টেলিগ্রাফ করা হয়েছে—আপনি যদি এ বিষয় একটু দেখেশুনে পাঠিয়ে দেন ত বাধিত হব। আশা করি ভালো আছেন।

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩

২১ মার্চ ১৯১২

শিলাইদা
নদিয়া

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আমার কপাল মন্দ—কপালের ভিতরে যে পদার্থটা আছে,

তারও গলদ আছে—নইলে ঠিক জাহাজে ওঠবার মুহূর্ত্তেই মাথা ঘুরে পড়লুম কেন? অনেক দিনের সঞ্চিত পাপের দণ্ড সেইদিনই প্রত্যূষে আমার একেবারে মাথার উপরে এসে পড়ল। রোগের প্রথম ধাক্কাটা তো এক রকম কেটে গেছে, এখন ডাক্তারের উৎপাতে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। লেখাপড়া নড়াচড়া প্রভৃতি সজীব প্রাণী মাত্রেরই যে সকল অধিকার আছে, আমার পক্ষে তা একেবারে নিষিদ্ধ। আপনাকে এই যে পত্র লিখচি এটা আইনবিরুদ্ধ হচ্চে; কিন্তু এমন করে আইন মেনে মরে থাকার চেয়ে আইন লঙ্ঘন করে মরা ভাল। অনেকদিন থেকে অনেক কল্পনা করেছিলুম, কিন্তু যবনিকার অন্তরালে এমন প্রহসনের প্লট যে ঘনিয়ে আসছিল, তা স্বপ্নেও মনে করতে পারিনি। সেদিন সকালে সহজে হার মানিনি—মাথা তোলবার চেষ্টা বারবার করেছিলুম, কিন্তু অদৃষ্ট বারবারই মাথা নত করে দিলেন। বিছানা থেকে কোনোমতে গাড়িতে গিয়ে উঠ্‌ব সেও ঘটল না।

যাক্—নিজেকে ত ফাঁকি দেওয়া গেলই, কিন্তু আপনাকে ফাঁকি দিলুম এই দুঃখই আমাকে সবচেয়ে বাজ্‌চে। এখন মনে হচ্চে আপনি একটা বন্ধন থেকে মুক্ত হলেন—আমাকে নিয়ে খুব সম্ভব আপনাকে বিপদে পড়তে হ'ত। ঈশ্বর আপনার যাত্রাকে সর্ব্বতোভাবে শুভ করুন, সফল করুন, এই আমার অন্তরের কামনা। ইতি ৮ই চৈত্র ১৩১৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪ শিলাইদা
২ এপ্রিল ১৯১২ নদিয়া

ওঁ

প্রিয়বরেষু

রোগশয্যার বালিশে হেলান দিয়েই আপনাকে এডেনের ঠিকানায় একখানা পত্র লিখেছি, পেয়েছেন কিনা কে জানে! আজ লিখচি শিলাইদহে আমার তেতালার ঘরটিতে বসে। চারিদিকের খোলা জানলা দরজা দিয়ে অজস্র আলোয় আমার ঘর ভরে গিয়েছে—পাশে একটি পিরিচে বসন্তের বেল ফুলগুলি রাশীকৃত রয়েছে, তার গন্ধে আমার হৃদয়ের ভিতর পর্য্যন্ত যেন সুগন্ধ হয়ে উঠেছে।

এখনও মাথাটা কাজের যোগ্য হয়নি। কিন্তু একেবারে বেকার বসে থাকাও অল্প ক্ষমতার কাজ নয়—সেও পারিনি। সকাল বেলাতে খাতা ও পেন্সিল হাতে নিয়ে গুন্-গুন্ করে একটু আধটু কবিতা লিখি মাত্র—তার বেশি আর কিছু নয়। এখানে আসার পর থেকে রক্তপাতটা[১] একেবারেই বন্ধ আছে, তাতেই মনটা নিশ্চিন্ত বোধ করচি—নইলে কবিতার মৃদুমন্দ গুঞ্জনধ্বনিটুকুও নিশ্চয়[২] বন্ধ থাক্‌ত।

ইতিমধ্যে দুটো তিনটে ষ্টীমার যাত্রী নিয়ে নীল সমুদ্র পার হবে, আমার তাতে স্থান হবে না। আজকাল ভিড় বেশি। ভিড় যখন কমবে, তখন আমি আবার একদিন যাত্রা করব—এবারে আর সাথী কেউ থাকবে না। মনে একটা সান্ত্বনা এই আছে—ততদিনে আপনার আড়াই মাসের মেয়াদ[৩] উত্তীর্ণ হয়ে যাবে—তখন আপনার ছুটির সঙ্গে আমার ছুটি ঠিক একসুরে মিলতে পারবে।

হয়তো মে মাসের ২২শে তারিখে City of Poona জাহাজে

ঠাঁই পাওয়া যাবে। কিন্তু নিশ্চয় জানিনে। যদি না পাই তবে জুনের আরম্ভে একটা কোনো বাহন জুট্‌বে। ততদিনে অনেকটা সেরে উঠ্‌ব আশা করচি। যা হোক্ আপনার প্রোগ্রামে আমার জন্যে একটু স্থান রাখবেন এবং সুরেনবাবুকে[৪] আমার কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন—এবং বাংলা দেশের ছুটির দিনের এই বসন্তের হাওয়ার কথা স্মরণ করে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌বেন। ইতি ২০শে চৈত্র ১৩১৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. এটা সম্ভবত কবির অর্শরোগের রক্তপাত। প্রভাতবাবু তাঁর রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড গ্রন্থে এক জায়গায় লিখেছেন—'ইতিমধ্যে কবির 'শরীরটা কিছু বিগড়েছে'। 'অর্শের রক্তপাত কিছুদিন থেকে বেড়েছে।' এই রোগে বহু কাল হইতে তিনি ভুগিতেছেন। বিলাত আসার অন্যতম কারণ ছিল এই অর্শ চিকিৎসা।'

২. কবির এই চিঠির পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়—তিনি চিঠির একটা পাতায় এই 'নিশ্চয়' পর্যন্ত লিখে অপর পাতায় চিঠির বাকিটা লেখেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ওই অপর পাতার মাথার বাঁদিকের কোণটা ছিঁড়ে হারিয়ে যাওয়ায় তারপর পাওয়া যাচ্ছে—' ক্‌ত।' মনে হচ্ছে ওই হারানো জায়গায় কবি লিখেছিলেন— বন্ধ থাকত বা স্তব্ধ থাকত। মূল না পাওয়ায় বন্ধ থাকত ই লিখলাম।

কবির এই চিঠি আগে ১৩৫৫ সালের শারদীয় দেশ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। সেখানে চিঠির এই অংশের 'এখানে আসার পর' থেকে ওই 'থাক্‌ত' পর্যন্ত না ছেপে ওই জায়গায় '...' দেওয়া আছে।

৩. দ্বিজেনবাবু তাঁর হাসপাতালে আড়াই মাসের ছুটি নিয়ে বিদেশে গিয়েছিলেন।

৪. সুরেনবাবু দ্বিজেনবাবুর দাদা। তিনি তখন বিলাতে ছিলেন।

১৫

১৩ মে ১৯১২ শিলাইদা
নদিয়া

প্রীতিনমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন

আগামী ২৭শে মে তারিখে বম্বাই বন্দর হতে City of Glasgow জাহাজ বিলাত রওনা হবে, আমরা তার যাত্রী। অর্থাৎ আজ হতে ঠিক একমাস পরে য়ুরোপের মাটিতে পদার্পণ করব যদি তার মাঝখানেই সমুদ্র আমাকে দাবি না করে বসে। আমি নিতান্তই মাটির মানুষ। কিন্তু জল যখন বেঁকে দাঁড়ান তখন সে পরিচয় তিনি মানেন না।

বোধ হয় লক্ষ্য করে থাকবেন যাত্রী শব্দের পূর্বে বহুবচন প্রয়োগ করেছি। সেটা কেবলমাত্র গৌরবার্থে নয়। আমার সঙ্গে রথী ও বৌমা যাচ্চেন।[১] কিন্তু তাই বলে আপনাকে ছাড়চিনে—একমাসের আগাম নোটিস্ দিয়ে আপনাকে রিজার্ভ করে রাখচি।

এই পত্র আপনার হস্তগত হবার অনতিকাল পরেই যখন স্বয়ং সশরীরে উপস্থিত হব, তখন অধিক বাক্যব্যয় করব না, কিন্তু একটি কথা বলে রাখি, আপনি যে ভয় দেখিয়ে রেখেছেন, সেখানে আমার mission আছে ঐটে ঠিক ডাক্তারোচিত ও বন্ধুর যোগ্য কথা হয়নি। মিশনের সঙ্কট থেকে যদি আমাকে না বাঁচাবেন তবে কোথায় আপনার সহৃদয়তা? ঈশ্বর বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে আমাকে সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য করেই সৃজন করেছেন, কিন্তু আপনারা আমাকে কেবলি কাজে জুড়ে দিয়ে তাঁর সেই অদ্ভুত সৃষ্টিটাকে পণ্ড করতে চান?

আপনাকে সেই বসন্তের দিনে এই তেতালার খোলাঘর থেকে পত্র লিখেছিলেম—এবারও সেই ঘরটি, কিন্তু আকাশে বাতাসে

সেই সুগন্ধ বাসন্তী মদিরার নেশার ঘোর আর নেই—আজ এখানে বসে বসে এক একদিন অপরাহ্নে পশ্চিম দিগন্তে কালবৈশাখীর ষড়যন্ত্র দেখ্‌তে পাই। আজই সেই রকমের একটা আভাস পাচ্চি। কালীবর্ণ মেঘ কেশর ফুলিয়ে সূর্য্যাস্ত আভায় চক্ষু রাঙিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়েছে—বহু দূর নদীর তীরে বালি উড়ে আকাশকে ফ্যাকাশে করে দিয়েছে—পাগল তার দরজা ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে—এসে পড়ল বলে, আর দেরি নেই।

এবার ২৫শে বৈশাখে আমার জন্মদিনে খুব ঝড়বৃষ্টির মধ্যে দিন শেষ হয়েছে। মনে মনে ভাবচি হয়তো জীবনে আর একটা যুগ শুরু হবে। ১৩০৫ শালের বর্ষ শেষের ঝড় এইখানেই দেখেছিলুম, তার পরেই জীবনের এক যুগান্তরে প্রবেশ করতে হয়েছিল। ইতি ৩০ বৈশাখ ১৩১৯

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড গ্রন্থে লিখেছেন—রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লইয়া বিলাত যাত্রা করিলেন (১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯, ১৯১২ মে ২৪)।

রবীন্দ্রনাথের এই যাত্রায় তাঁর সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ এবং প্রতিমা দেবী ছাড়াও শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের তখনকার ছাত্র সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মণও ছিলেন।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন—'আমাদের অভিভাবকত্বে শান্তিনিকেতনের একটি ছাত্র ওই একই জাহাজে রওনা হ'ল। তার গন্তব্য হার্ভার্ড—সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে সে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে ইচ্ছুক। এ ছেলেটি একেবারে আনকোরা আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্র, পশ্চিমী কায়দা কানুনে একান্ত অনভিজ্ঞ, একে নিয়ে আমাদের ভালো এক বিপদ হ'ল। আশ্রমে খালি পায়ে হাঁটা চলার অভ্যাস, সুতরাং জুতো মোজা এর কাছে অনাবশ্যক বাহুল্য, প্রায়ই একে দেখা যেত প্রথম শ্রেণীর ডকে খালি পায়ে চলাফেরা করছে।'

১৬

[১৭ জুন ১৯১২] লণ্ডন

ওঁ

প্রিয়বরেষু

ছুটি মঞ্জুর। একটা মাস যাক্ তার পরে দেখা যাইবে। কাল লণ্ডনে পৌঁছিয়া আপততঃ একটা হোটেলে আশ্রয় লইয়াছি। কোথাও একটা বাসার সন্ধানে বাহির হইতে হইবে কারণ আমরা স্বভাবত হোটেলচারী জীব নহি। মনে করিতেছি, ইতিমধ্যে একবার Walesএ কোনো স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর জায়গায় গিয়া আশ্রয় লইব। শরীরটাকে যদি একটু সারিয়া সুরিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইবার সুবিধা হইবে। লণ্ডনের গোলকধাঁদার মধ্যে ঘুরপাক খাইবার সখ আমার নাই—হোটেলের জানলার ভিতর দিয়া রাস্তার দিকে তাকাইয়া দেখি আর ভাবি এখানে আমার মত মানুষের স্থান কোথায়? যদি কোথাও থাকে তবে কবে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব? পৃথিবীতে অকেজো মানুষের উপযুক্ত জায়গা মেলা বড় কঠিন। যখন ছাত্র ছিলাম তখন লণ্ডনটা গায়ে ঠিক ফিট করিত, এখন বেজায় আঁট বোধ হইতেছে। কোথায় আমার খোলা মাঠ, কোথায় আমার আলোকভরা আকাশ!

কিন্তু আপনি এখন ডাক্তারি লেকচার শুনিতেছেন। অলস ব্যক্তির মনোবেদনা আপনি ঠিক বুঝিতে পারিবেন না, বিশেষত যখন এ বেদনার সঙ্গে শরীরতত্ত্বের কোনো অংশের কোনো যোগ নাই। অতএব আপাতত এখানকার পাতালপুরীর নলের ভিতর দিয়া একবার Rothenstein সাহেবের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িব। কুকের কেয়ারে যদি পত্র লেখেন, তবে পাইব। একবার ভাবিয়াছিলাম আপনার বাসায় গিয়া হঠাৎ চমক লাগাইয়া দিব, কিন্তু সেটা নিশ্চয়

আপনার বর্ত্তমান অবস্থায় স্বাস্থ্যকর হইবে না অতএব আপনার প্রতি দয়া করিয়া নিরস্ত হইলাম। ইতি তারিখটা মনে পড়িতেছে না। সোমবার

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭

[? জুন ১৯১২]

3 Villas on the Heath
Vale of Health
Hampstead
N.W.

ওঁ

প্রিয়বরেষু

সুরেন্দ্রবাবুর ঠিকানা আমি জানি না, নিশ্চয় তিনিও আমার ঠিকানা জানেন না, অথচ সাত সমুদ্র পার হইয়া এমন করিয়া পরস্পরের অগোচরে থাকিবার ত কোনো হেতু দেখি না। আপনি বলিয়াছিলেন, তিনি জুনের শেষ সপ্তাহেই এখানে আসিবেন—জুনের সব কটি সপ্তাহই ত শেষ হইয়া আসিল, অতএব আমাকে তাঁহার বা তাঁহাকে আমার সন্ধানটা বলিয়া দিবেন।

আমি যেখানে বাসা করিয়াছি, শহরের লোক সেখানে হাঁফ ছাড়িতে আসে। একটা ছোট বাড়ি লইয়াছি। ছয় সপ্তাহ মেয়াদ। ততদিনে আশা করি আপনার দুর্ব্বলতা ঘুচিয়া যাইবে। এখন আপনি নিশ্চয়ই পরীক্ষার পাকের প্রায় কেন্দ্রস্থলে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন—বেশি কিছু লিখিবেন না—কেবল ঠিকানাটা লিখিয়া পাঠাইবেন।

আমি এখানে নব পরিচয়ের আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া দ্রুতবেগে নিমন্ত্রণের চক্রে ঘুরিতেছি। এমনতর ঘুরপাক আমার অভ্যাস নাই। কিন্তু যে দেশে আসিয়াছি, এখানে স্থির হইয়া থাকার আশা করা বিড়ম্বনা; অতএব নালিশ করিব না, কিন্তু Sea Sickness-এর মত আমার জনতা Sickness লাগিতেছে।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮
১৫ জুলাই ১৯১২

3 Villas on the Heath
Vale of Health
Hampstead

প্রিয়বরেষু

এই বুঝি! সমুদ্রের পূর্ব্বপারে আমি আপনাকে ফাঁকি দিয়াছি—আর সমুদ্রের পশ্চিমপারে আপনি বুঝি তাহার শোধ লইতে বসিয়াছেন। কিন্তু হীদেন দেশে আমি যদি আপনাকে আঘাত করিয়া থাকি, খৃষ্টান দেশে আপনি তাহার প্রতিঘাত করিবেন ইহাও ত ধর্ম্মসঙ্গত নহে। আপনি যে কেবল ফাঁকি দিতেছেন, তাহা নয়, তাহার উপর আবার লোভ দেখাইতেছেন। মনে জানেন আমি আপনার সঙ্গে জুটিতে পারিব না অথচ নিমন্ত্রণের চিঠি পাঠাইয়া ভোজের খবরটা দেওয়া নিষ্ঠুর কৌতুক ছাড়া আর কিছুই নহে। যাহাই হউক, মনে করিবেন না এ যাত্রায় আপনিই জিতিলেন। পাহাড় পর্ব্বত নদীসমুদ্র যত বড় জিনিষই হউক, মানুষের কাছে কেহই লাগে না। আমি এখানে আসিয়া মানুষের মধ্যে যে আনন্দ, শিক্ষা ও গৌরবলাভ করিয়াছি, এমন কোনোদিন আশা করি নাই;

—যদি ইহা হইতে বঞ্চিত হইতাম, তবে এখানে আমার আসা একেবারে ব্যর্থ হইত। অতএব জুলাইয়ের শেষ পর্য্যন্ত আমি লণ্ডনের বেড়াজালে আটকা পড়িয়া গেছি। তাহার পর অগস্টের আরম্ভে এক সপ্তাহ Buxtonএ কাটাইবার কথা। সেখানে Mrs. Mann আছেন, তিনি ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের য়ুরোপীয় ওস্তাদ—এই অভূতপূর্ব্ব মিশ্রণের পরিচয় লইতে হইবে। তাহা ছাড়া সকলেই বলিতেছে, স্থানটি যেমন স্বাস্থ্যকর তেমনি সুন্দর। সেখানে সপ্তাহ কাটাইয়া এ দেশের আধুনিক পাশ্চাত্য ঋষি Edward Carpenter এর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য Holmerfieldএ যাইব। আশা ছিল, এই সমস্ত তীর্থযাত্রায় আপনার সঙ্গলাভ করিব—আশা এখনো ছাড়ি নাই—কিন্তু তাহা অনেকটা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে—এ অবস্থায় যদি সে রক্ষা পায় তবে সে কেবল ডাক্তারের কৃপাগুণে।

আপনার দাদার সঙ্গে দুই একদিন হইতে দেখা সাক্ষাৎ ঘটিতেছে। বিবরণ বোধ করি তাঁহার কাছ হইতেই পাইবেন।

সমুদ্রের এপারে কোনো সুযোগে যদি দেখা ঘটে, তবে অন্য অন্য কথা হইবে, নতুবা কোনো একদিন সেই গঙ্গার ধারের ছাদের উপরে মোকাবিলায় কথাবার্ত্তা হইতে পারিবে। ইতি ৩১ আষাঢ় ১৩১৯

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লন্ডনে কবির সঙ্গে দ্বিজেনবাবুর আবার দেখা হয়েছিল। আর শুধু দেখা হওয়াই নয়, তিনি কবির সঙ্গে আমেরিকায়ও গিয়েছিলেন।

১৯

Illinois
U.S.A.

ওঁ

প্রিয়বরেষু

এখানে এসে অবধি সূর্য্যের আলো, আকাশ, অবকাশ এবং বন্ধুসঙ্গ পাওয়া যাচ্চে, কিন্তু আপনার কোনো খবর পাওয়া যাচ্চে না—এর অর্থ কি? বোধ হয় প্রবাসের কামধেনুটিকে অহোরাত্র খুব কষে দোহন করে নিচ্চেন। আটলান্টিক ঝাঁকানি দিয়ে যেটুকু খালি করে দিয়েছে তার চতুর্গুণ আপনি সংগ্রহ করে নিয়ে যাবেন এই আমি আশা করচি। আজ পর্য্যন্ত আমি এখানকার অধ্যাপক ব্রুকসের বাড়িতে অতিথি ভাবে দিন যাপন করচি। এঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চমৎকার লোক—আলাপ আলোচনা যত্ন আদর কিছুরই ত্রুটি হচ্ছে না। স্নানাহারের ব্যবস্থাও বেশ পর্যাপ্ত। এঁরা আপনার জন্যেও এখানে একটি ঘর সজ্জিত করে রেখেছিলেন—যদি আসতেন তাহলে হাঁসপাতালের অভাবে আপনাকে ব্যাকুল করত সন্দেহ নেই—কিন্তু ঘরের কষ্ট হত না। আমরা একটা আস্ত বাড়ি এক বছরের মত ভাড়া নিয়েছি। রথীও তার কলেজের অধ্যয়ন পদ্ধতি ঠিক করে নিয়েছে। বৌমা খুব আদরে আছেন—এখানে তাঁর সকল রকমের শিক্ষার ব্যবস্থা ভালই হবে। রথীর প্রতি এখানকার সকল অধ্যাপকেরই বিশেষ একটা শ্রদ্ধা এবং প্রীতি আছে—সকলেই তাকে পেয়ে খুব খুসি হয়েছেন—এই কারণে এখানে রথী যে রকম অযাচিত আনুকূল্য পাবেন সে রকম আর কোথাও আশা করা যায় না। সংক্ষেপে আপনার সংবাদ দেবার জন্যে একটু সময় করে নেবেন। আমার অন্তরাত্মা

৩

এই ফাঁকা জায়গায় এসে একটু হাঁপ ছাড়বার সুযোগ পেয়েছে। ইতি ৫ নভেম্বর ১৯১২

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী' গ্রন্থে লিখেছেন—'রবীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী ২৮ অক্টোবর ১৯১২ (১২ কার্তিক ১৩১৯) আমেরিকার নিউইয়র্ক মহানগরীতে পৌঁছিলেন; বিলাতে রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে দুইবার আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমেরিকায় এই প্রথম পদার্পণ।...

নিউইয়র্কে কয়েকদিন থাকিয়া তাঁহারা আর্বানা (ইলিনয়) যাত্রা করিলেন। রথীন্দ্রনাথ, সন্তোষচন্দ্র ও নগেন্দ্রনাথ ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র।' —২য় খণ্ড—৪র্থ সংস্করণ

রবীন্দ্রনাথ নিউইয়র্কে পৌঁছে অজিতকুমার চক্রবর্তীকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তা থেকে জানা যায়, তিনি ২৮শে নয় ২৭শে অক্টোবর নিউইয়র্কে পৌঁছেছিলেন। —দ্রঃ প্রবাসী ১৩৪১ চৈত্র, পৃঃ ৭৫২।

রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী আগেই আমেরিকা চলে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের যাবার সময়ে ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র তাঁর সঙ্গী হন।

রবীন্দ্রনাথের এ যাত্রার সঙ্গী ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র 'জয়ন্তী উৎসর্গ' গ্রন্থের অন্তর্গত তাঁর 'রবীন্দ্র সংসর্গে' প্রবন্ধে লিখেছেন—'আমরা এক সঙ্গে আমেরিকা যাচ্ছি। নভেম্বর মাস। কবি ও আমি এক কেবিনে।'

এখানে দ্বিজেনবাবু যে লিখেছেন—নভেম্বর মাসে তাঁরা আমেরিকা যাত্রা করেছিলেন, এটা ভুল। হবে অক্টোবর মাস।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে 'বাবার সঙ্গে বিদেশে আমেরিকায়' অধ্যায়ে লিখেছেন—'অক্টোবর মাসে আমরা রওনা হয়ে গেলাম আমেরিকার দিকে।'

৫০টি রাষ্ট্রের ইউনাইটেড্ স্টেট্স অব্ আমেরিকা বা ইউ. এস. এ.-র একটি রাষ্ট্র ইলিনয়। আর্বানা ইলিনয়ের একটি শহর।

রথীন্দ্রনাথের পরিচিত আর্বানা শহরে পিতার থাকার সুব্যবস্থা করার জন্যই সম্ভবত রথীন্দ্রনাথ সস্ত্রীক আগেই আমেরিকায় চলে গিয়েছিলেন।

২০

508, W. High Street
Urbana,
Illinois, U.S.A.
13 Nov, 1912.

ওঁ

প্রিয়বরেষু

চিঠিপত্র কিছু না পেয়ে আমি ভাবছিলুম আপনি তবে বুঝি এতক্ষণে মেয়ো হাঁসপাতালের পথে। যা হোক এখন তা হলে কিছুদিন এখানেই আপনার অবস্থান হবে। কিন্তু যদি মেয়ো ভ্রাতাদের[১] সন্ধানে আমাদের আঙিনার সামনে দিয়েই যান আর এখানে না আসেন তাহলে আমাদের প্রতি আপনার ভ্রাতৃভাব প্রকাশ হবে না। একটুখানি না হয় বেঁকেই গেলেন। এখানে আপনার আদর-যত্ন আতিথ্যের কোনো ত্রুটি হবে না—কেননা এখানেও সহৃদয় লোক আছে। Rothenstein আপনার জন্যে New Yorkএ Dr. Dunham এর নামে একটা চিঠি দিয়েছেন, সেটা এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। Dr. Flexner এর চিঠিও পাঠাব—আমার ওতে কোনো প্রয়োজন দেখিনে—আমি এদেশে যতদূর সম্ভব চুপচাপ থাকতে চাই। লোকসঙ্গের আবর্ত্তে যথেষ্ট পাক খেয়েছি—এখন কিছুদিন নিভৃতের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসতে চাই—গভীর পরিপূর্ণতার জন্যে মনের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা বোধ হচ্চে—এই বেদনার সমাধান কবে হবে কিছুই জানিনে—নিজেকে নিয়ে কারবার করা আর আমার চল্‌চে না—একেবারে নিঃশেষে দেউলে হয়ে যেতে পারলে বেঁচে যাই। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. 'মেয়ো ভ্রাতা'দের—বিখ্যাত চিকিৎসকদ্বয়, চার্লি ও উইলি মেয়ো।

২১

508, W. High Street
Urbana, Illinois.
9 Dec. 1912

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আপনি আচ্ছা লোক! কোথায় ঘুরে বেড়ালেন আর কখন দৌড় দিলেন তার কোনো দিশে পাওয়া গেল না। এদিকে আপনার অভ্যর্থনার জন্যে একখণ্ড সদ্য প্রকাশিত ইংরেজি গীতাঞ্জলি[১] অর্ঘ্য-স্বরূপ সাজিয়ে পথ চেয়ে বসেছিলুম—সমস্ত ব্যর্থ হয়ে গেল। Fox Strangwaysকে লিখে দেব আপনাকে একখানা বই দেবার জন্যে। কিন্তু আপনি যে কোথায় থাকবেন তাও তো জানিনে। যা হোক্ এখন যে ঘাটে গিয়েছেন সেটা পাথুরেঘাটার কতকটা কাছে এই একটা সান্ত্বনার বিষয় দেখ্‌তে পাচ্চি। লণ্ডনের খবর কি? আমাদের সেই কাউন্টের কি রকম অবস্থা? আশা করি এখনও বেঁচে আছেন, যদি থাকেন আমাদের নমস্কার জানাবেন—আমাদের বাড়িওয়ালীদেরও আমাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। আমরা সম্ভবত মে কিম্বা জুনে লণ্ডনে ফিরব[২]—যদি জায়গা পাওয়া যায় তবে ওদের ঘরে গিয়েই উঠ্‌ব। আমার বক্তৃতার পালা এখনো শেষ হয়নি—চারটে পড়েছি, পঞ্চমটা লিখচি—হতে হতে অনেকগুলো জমে যাবে। এদিক ওদিক থেকে বক্তৃতার আমন্ত্রণ পাওয়া যাচ্চে কিন্তু আপনি ত জানেন আমার পক্ষে একলা ঘুরে বেড়ানো কতদূর অসম্ভব—বাহন না হলে আমার একেবারেই চলে না। রথী এখানে পড়ায় লেগে গেছে তাকে নড়াতে চাইনে—বৌমারও এখানে বেশ চল্‌চে। রোটেনস্টাইনের সঙ্গে বোধ

করি দেখা হয়েছে—তাঁকে আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানাবেন—তাঁর বন্ধুত্ব আমি কোনোদিন ভুল্‌তে পারব না—সমুদ্র পার হয়ে এই আমি একটি মহার্ঘ্য রত্ন লাভ করেছি। ব্রজেন্দ্রবাবু কি রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়েছেন? কোনো মতে তাঁকে ওখানে ধরে রাখতে পারলে আমাদের দেশের একটা মস্ত কাজ হত। আমি থাকলে হয়ত একটা কোনোরকম জোগাড় করতে পারতুম। নিউইয়র্কে আপনাকে একটা দ্বিতীয় চিঠি লিখেছিলুম, সেটা বোধ হচ্চে আপনি পাননি।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. ১৯১২ খৃস্টাব্দের ১৯শে মার্চ রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেনবাবু একসঙ্গে কলকাতা থেকে বিলাত যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যাত্রার পূর্বমুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় যেতে পারেন নি। দ্বিজেনবাবু একাই যান। একথা আগে বলেছি।

অসুস্থ রবীন্দ্রনাথকে তাঁর চিকিৎসকরা তখন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে উপদেশ দেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্রাম নেবার জন্য তাঁদের জমিদারি পদ্মাতীরে শিলাইদহে যান। সেখানে গিয়ে তিনি তাঁর গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, খেয়া প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে আধ্যাত্মিক বিষয়ক বেশ কিছু কবিতার ইংরাজি অনুবাদ করেন।

রবীন্দ্রনাথ সুস্থ হয়ে এবার পুত্র ও পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে ১৯১২র ২৪শে মে কলকাতা থেকে বিলাত যাত্রা করেন। বিলাত যাওয়ার সময় রবীন্দ্রনাথ নিজের ওই ইংরাজি অনুবাদের খাতাটিও সঙ্গে নেন।

লন্ডনের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী উইলিয়ম রোটেনস্টাইন ১৯১১ খৃস্টাব্দে একবার ভারত ভ্রমণে এলে সেই সময় তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সামান্য পরিচয় হয়েছিল। সেই পরিচয়ের সূত্রে রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে গিয়ে রোটেনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করেন।

রোটেনস্টাইন ইংরাজি গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি পড়ে মুগ্ধ হন। এবং নিজের গৃহের নিকটেই রবীন্দ্রনাথের থাকার জন্য একটা বাসাও ঠিক করে দেন। এরপর তিনি ইংরাজি গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি টাইপ করে ওখানকার কয়েকজন সাহিত্যিক ও সাহিত্য রসিকের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং পরে নিজের বাড়িতে তাঁদের আমন্ত্রণ করে ওই ইংরাজি গীতাঞ্জলির আলোচনার জন্য এক সভাও আহ্বান করেন। সেদিনের সভায় আইরিশ কবি উইলিয়ম বাটলার, ইয়েটস্, ইংরাজ কবি মেসফিল্‌ড, আরনেস্ট রিহস, এজরা পাউন্ড, এভেলিন আন্ডারহিল, রবার্ট ট্রেভেলিন, কুমারী সিনক্লেয়ার, দিল্লীর সেন্ট স্টিফেন কলেজের অধ্যাপক রেভারেন্ড সি. এফ. এন্ড্রুজ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। এন্ড্রুজ তখন কিছুদিন যাবৎ ভারতবাসী হলেও সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথকে দেখলেন। ওই সভায় রবীন্দ্রনাথ এবং রোটেনস্টাইন ত ছিলেনই, আর ছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন বন্ধু পূর্বোক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র। রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে গিয়ে পৌঁছলে দ্বিজেনবাবু কবির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন এবং প্রায়ই তাঁর বাসায় যেতেন।

ইংরাজি গীতাঞ্জলি পড়ার ওই সভায় উপস্থিত সকলেই কবির রচনার অজস্র প্রশংসা করেন, বিশেষ করে কবি ইয়েটস্। তিনি পরে একসময় দ্বিজেনবাবুর কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনেক কথা জেনেও নেন এবং ইংরাজি গীতাঞ্জলি গ্রন্থ আকারে বেরোবার আগে তিনি যে মুখবন্ধ লিখে দেন, তাতে সেই কথাও লেখেন। এ সম্পর্কে দ্বিজেনবাবু তাঁর 'রবীন্দ্র সংসগে' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন—'কবি ইয়েটস্ রবীন্দ্রনাথের কথা ভালো করে একটু জানবার জন্য আমাকে একদিন ডিনারে নিমন্ত্রণ করলেন। রাত্রি প্রায় দেড়টা পর্যন্ত কথাবার্তা হ'ল। তখন আদৌ বুঝতে পারি নি যে তার থেকে আমার কিছু কিছু কথা ইংরাজি গীতাঞ্জলির ভূমিকায় উদ্ধৃত করবেন। ইয়েটস্ই সাগ্রহে ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ওই পুস্তকের ইন্‌ট্রোডাকসান বা পরিচয় পত্র লেখেন।'

এরপর রবীন্দ্রনাথ লন্ডন থেকে আমেরিকায় যাত্রা করেন। সঙ্গে দ্বিজেনবাবুও যান। তাঁরা আমেরিকায় গিয়ে পৌঁছান ২৭শে অক্টোবর (১৯১২)। রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় ছিলেন ছ মাস। দ্বিজেনবাবু অল্প কয়েকদিন আমেরিকায় বেড়িয়ে আবার ইংলন্ডে ফিরে আসেন এবং তার কিছুদিন পরেই দেশে চলে আসেন।

রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় থাকাকালে ওই ১৯১২র নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে লন্ডনের ইন্ডিয়া সোসাইটি ইংরাজি গীতাঞ্জলি বা Song Offerings

ছেপে গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করেন। গ্রন্থ বিক্রির ভার নেন ম্যাকমিলন কোম্পানি। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হলে তখন ইংলন্ডে সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিক মহলে এর প্রচুর প্রশংসা হয়।

২. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে 'বাবার সঙ্গে বিদেশে—আমেরিকায়' অধ্যায়ে লিখেছেন—১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি আমরা আমেরিকা থেকে [লন্ডনে] ফিরলাম।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী' ২য় খণ্ড, ৪র্থ সং গ্রন্থে লিখেছেন—১৭ এপ্রিল ১৯১৩, লন্ডনে ফিরিয়া রবীন্দ্রনাথ আশ্রয় পাইলেন শিকাগোর মিসেস্ মুডির বাসায়।

২২

C/O. Messrs. Thomas Cook & Sons,
Ludgate Circus,
London.
22.5.13

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আপনার সব চিঠিরই ত জবাব দিয়েছি তবু যে অভিযোগ করতে ছাড়েননি সেটা বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছেন। আমার একজন আত্মীয় আছেন তিনি মাসের মধ্যে বার দুই তিন হঠাৎ বিনা কারণে তাঁর চাকরকে সাধারণভাবে খুব ভর্ৎসনা করে নেন—কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলেন, ধমক খেলেই চাকরটা মনে করবে যে সব দোষ লুকিয়ে করেছি সেগুলো নিশ্চয়ই বাবুর কাছে ধরা পড়ে গেছে। কি জানি বন্ধুত্বের কোথায় কোন্ অপরাধ লুকিয়ে রয়ে গেছে এই মনে করে মাঝে মাঝে তাড়া দিলে হয়ত কাজে লাগ্‌তে পারে। আমার ত হঠাৎ মনে হয়েছিল, হবেও-বা, জবাব

দিতে হয়ত-বা ভুলেছি। কিন্তু ভেবে দেখলুম ওটা নিতান্তই ইংরেজি ভাষায় যাকে বলে ব্লাফ।

আমেরিকায় অধিকাংশ সময়টা অজ্ঞাতবাসে ছিলুম। শেষের দুটো মাস Wisconsin, Chicago, Boston প্রভৃতি শহরে বক্তৃতা করতে বেরতে হয়েছে। ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু আমেরিকানরা যখন তখন আইসক্রিম খাবেই এবং বক্তৃতা না শুনে ছাড়বে না—তাতে তাদের শরীর ও মনের হজম শক্তিটা একেবারে মাটি হয়ে যায়। দায়ে পড়ে বক্তৃতা করেছি হাততালিও পাওয়া গেছে—আমার বা তাদের ক্ষতি বিশেষ কিছু হয়নি, লাভ হয়েছে কিনা সে হিসাব করবার সময় এখনো আসে নি। সেই বক্তৃতার পালা এখানেও আরম্ভ হয়েছে—প্রথমটা পড়া হয়ে গেছে—তাতে বোধ হচ্চে এগুলো মাঠে মারা যাবে না।

আপনার গীতাঞ্জলিখানা[১] এখনো হাতে আছে একেবারে হাতে তুলে দেওয়া যাবে, কি বলেন? নায়কে, বসুমতীতে আপনাকে মধুর সম্ভাষণে অভ্যর্থনা করচে না এতে আমার দুঃখিত হওয়া উচিত ছিল কিন্তু মনের মধ্যে কেমন অন্যায় রকমের একটা সুখ বোধ হচ্চে—মনে হচ্চে, যা হোক্ অপমানের একজন সরিক পাওয়া গেল।[২]

ইতিমধ্যে আয়র্লন্ডে ডাকঘরের অভিনয় আরম্ভ হয়েছে—ইয়েটসের কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল।

'The play was very successful with the house, which was quite enthusiastic. I think the performance was middling, the stage clothes worried the players and we had not quite as much time as we should

have had for rehearsal but everything went very smoothly. Everyone I have met likes the play.'

এইটে আবার ভাল করে হবে। একদিন একটা সভায় চিত্রাঙ্গদার তর্জ্জমাটা পড়েছিলুম, সেটাও ত এদের বিশেষ ভাল লেগে গেছে।

যাই হোক্, মনের ভিতর দিকটাতে আরাম বোধ হচ্চে না—এই খ্যাতির শরশয্যায় শুয়ে খবর সেটা আমার কিছুতেই মনঃপূত হচ্চে না। বাইরের দিক থেকে প্রশংসা যা কিছু আসচে সে আমার বাইরের দেউড়ির দরোয়ানজির মেরজাইয়ের পকেটেই প্রবেশ করচে, ভিতরে আমার যে মানুষটি বসে আছে তার ভোগ এখনো এসে পৌঁছল না। তাই দেখচি দ্বারের বাইরে আবর্জ্জনা জমে উঠচে আর ঘরের ভিতরটাতে ফাঁক রয়ে গেল। ঘরের তদ্বিরে যাবার সময় পাব কখন তাই বসে বসে ভাবচি।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. দ্বিজেনবাবু দেশে ফেরার সময় এক খণ্ড ইংরাজি গীতাঞ্জলি ম্যাকমিলন কোম্পানি থেকে কিনে নিয়ে এলেও, রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে এসে নিজে তাঁকে এই গ্রন্থ এক খন্ড উপহার দিতে ইচ্ছা করেছিলেন।

২. কলকাতার সেকালের বিখ্যাত 'নায়ক' ও 'বসুমতী' পত্রিকা দুটির সম্পাদকরা ইংরাজি গীতাঞ্জলি আনিয়ে পড়েন এবং তাঁদের নিজ নিজ কাগজে ওই গ্রন্থের বিরূপ সমালোচনা লিখেও প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ বিলাতে বসেই কলকাতার বন্ধুদের কাছ থেকে নায়ক ও বসুমতীর বিরূপ সমালোচনার কথা জানতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ সেই সময় লন্ডন থেকে 'নায়ক' ও 'বসুমতীর' ওই সমালোচনার কথা নিয়ে দ্বিজেনবাবুকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন। দ্বিজেনবাবু অবশ্য কলকাতায়

থেকে আগেই নায়ক ও বসুমতীর ওই সমালোচনা পড়েছিলেন এবং সেই সমালোচনার কাগজ দুটিও সংগ্রহ করে রাখেন।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের 'নায়ক' ও 'বসুমতী' আজ আর কোথাও পাওয়া যায় না। দ্বিজেনবাবুর সংগৃহীত সেদিনের সেই নায়ক ও বসুমতীর সমালোচনার অংশ দুটি দ্বিজেনবাবুর পুত্র সত্যেনবাবুর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি। সেই সমালোচনা দুটি এখানে দিলাম। এতে দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ তখন বিদেশে প্রভূতভাবে সম্মানিত হলেও দেশের এক শ্রেণীর সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের কাছে কিরূপ অসম্মানিত হয়েছিলেন।

এবার বসুমতী ও নায়ক পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র সম্বন্ধে যে সমালোচনা বেরিয়েছিল, তার কিছু এখানে উদ্ধৃত করছি। প্রথমে বসুমতীর লেখা—

'অত্যুক্তির পরাকাষ্ঠা
কবি রবীন্দ্রের বিলাতী কীর্তি

...ইয়েটস্ নামক যে নাতিপ্রসিদ্ধ আইরিশ কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরাজি তর্জমার ভূমিকা লিখিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন যে, তিনি বাঙ্গলা ভাষা জানেন না এবং রবীন্দ্রনাথের ইংরাজি তর্জমার পাণ্ডুলিপি তাঁহাকে পড়িতে দেওয়া হইয়াছিল। কে পড়িতে দিয়াছিলেন, তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই। ওই তর্জমা পড়িলে উহা সরস বলিয়া ভাবিবার উপায় থাকে না। কিন্তু ইয়েটস্ লিখিয়াছেন যে, আমি এখানকার ভারতবাসীদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, এই কবিতাগুলি বাঙ্গলা ভাষায় উত্তম ছন্দো-বন্ধে রচিত এবং উহার মাধুরী নাকি এমন চমৎকার যে তাহার ভাষান্তর করা চলে না। অর্থাৎ ভূমিকা লেখক পরের মুখে ঝাল খাইয়াছেন, এবং যে যাহা ধরিয়া পাকড়াইয়া বলাইয়া লইয়াছেন, ভদ্রতার খাতিরে তাহাই কিছু বলিয়া গিয়াছেন। ভূমিকার ঠিক গোড়াতেই দেখিতে পাই যে, একজন লন্ডন-প্রবাসী বাঙ্গালী ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর বাঙ্গলার অশেষ গুণকীর্তন করিয়া ভূমিকা-লেখকের ভূমিকা লিখিবার উপাদান যোগাইয়াছেন। এই ডাক্তারটি যে ব্রাহ্ম তাহাও ওই ভূমিকা হইতেই অবগত হওয়া যায়। বিশেষতঃ পাঠকদিগকে বলিতে হইবে না যে, এই ডাক্তারটি হইতেছেন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র এম. বি.। ইঁহাকেই ইউরোপ যাত্রার সময়ে

রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে করিয়া লইবেন বলিয়া সংবাদ মুদ্রিত হইয়াছিল। ডাক্তার মৈত্র ইয়েটস্‌কে ঠিক যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার প্রধান প্রধান কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

আমি রোজই তাঁহার কবিতা পড়িয়া দুঃখ ভুলিয়া যাই।...

দেশে রবীন্দ্রনাথের মত কবি ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। আমরা এ যুগকে রবীন্দ্রনাথের যুগ বলি। ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের যত খ্যাতি, ইউরোপে কোনও কবির অদৃষ্টে তত খ্যাতি ঘটে নাই। —এই কবির গান গান্ধার হইতে ব্রহ্মদেশের ভিতরে পর্যন্ত গীত হয়।...

রবীন্দ্রনাথ খোকা বয়সে যে নাটক লিখিয়াছেন, কলিকাতায় এখনও তাহাই অভিনীত হয়।'

Yeats ভূমিকায় লিখেছিলেন—plays written when he was but little older are still played in Calcutta. বসুমতী-সম্পাদক ব্যঙ্গ করে little olderকে করেছেন, খোকা বয়স। আর ভূমিকার his songs are sung from the westকে করেছেন গান্ধার হইতে।

'বসুমতী' দ্বিজেনবাবু ছাড়া, ইয়েটস্‌-এর ভূমিকা লেখায় অপর এক সাহায্যকারী রবীন্দ্রভক্ত সম্বন্ধে লিখেছেন—'একজন বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘতপস্যা এবং ব্রহ্মধ্যানের কথা। ধ্যানের এই সাক্ষ্যদানের কথার পর প্রত্যক্ষ সাক্ষীটি বলিয়াছেন যে, চতুর্দশ পুরুষ ধরিয়া রবীন্দ্রনাথদের বংশে কেবল অসাধারণ প্রতিভাই জন্মগ্রহণ করিয়া আসিতেছে। ডাক্তার মৈত্রকে আমরা চিনি, কিন্তু এই সাক্ষীটি কে? ইনি রবীন্দ্রনাথের যে জয়ঢাকটি বহিয়া লইয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য জাহাজে কত মাশুল দিতে হইয়াছিল, তাহা জানিতে কৌতূহল হয়।...'

ইয়েটস্‌ ভূমিকায় লিখেছিলেন for generations, সেইটাকেই বসুমতী ব্যঙ্গ করে লেখেন—চতুর্দশ পুরুষ।

এবার নায়কের সমালোচনা—

'রবির খেলা
স্তবের ডালা
পড় সবে শনিবারের পালা

গেল নম্বর বসুমতী রবিবাবুর বিলাতী কীর্তি ফাঁস করিয়া দিয়াছেন। বিলাতে তাঁহার অভ্যর্থনা লইয়া তারের খবর পাঠানো, কাগজে প্রবন্ধ পাঠানো, সংক্ষেপত এই ছোটখাট 'হুজুগ' এখন জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল। এতক্ষণে বোঝা গেল যে, ইহার আদি ও মূল দুই তিনজন রবিভক্ত। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান অজানিত একজন ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র তাঁহাকে (বসুমতী কথাটি বেশ একটু ঘুরাইয়া বলিয়াছেন) রবীন্দ্রবাবু বিলাতে সঙ্গে লইয়া যাইবার সংবাদ কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল। অপর ভক্তের জাহাজের মাশুল কত দিতে হইয়াছিল, তাহাও বসুমতী বক্রভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

ডাক্তারেরা স্বাস্থ্য ও পীড়া সম্বন্ধেই সার্টিফিকেট দেয়। তাহার মূল্য কত জানি না। কিন্তু ডাক্তারেরা যে কবিত্ব ও ঋষিত্ব সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দিতে পারে, ইহা পূর্বে জানিতাম না। এই ঠাকুর পরিবারে পুরুষানুক্রমে কেবল ঋষি ও কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও বনের পশুপক্ষী আসিয়া তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও গায়ে আসিয়া বসে। (তখন তাঁহারা সেগুলিকে ঋষির মত ধরিয়া আহার করেন কিনা সে বিষয়ে ডাক্তারবাবু কোনো মতামত প্রকাশ করেন নাই।) রবিবাবু প্রত্যুষে উঠিয়া দু ঘন্টা কাল ধরিয়া ধ্যান করেন এবং তিনি হিন্দু সাধু ও ঋষিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ—এরূপ সার্টিফিকেট যে সে দিতে পারে না। তাই বসুমতী জাহাজের মাশুলের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

সার্টিফিকেটে চাকরি হয় জানিতাম। সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও ঋষি হয় জানিতাম না। ঠাকুর বাড়ির একজন সার্টিফিকেটের জোরে চিত্রকর হইয়া গিয়াছেন। এখন রবিবাবু ডাক্তারের সার্টিফিকেটের জোরে কি না হইলেন! দেখিতেছি যে তিনজনে মনে করিলে ও চেষ্টা করিলে কি না করিতে পারে! 'পরিষৎ'কে তো গাধা বানাইতে পারেই, একজন গোবেচারি ইংরেজকে ভেড়া বানাইতে পারে। রবিবাবু এই সব পারিবারিক কথা কবিতা পুস্তকের ভূমিকায় ছাপাইয়াছেন! লজ্জা করে নাই? তিনি চিরদিনই ধৃষ্ট। ... শেষে বৃদ্ধ বয়সে নিজের কবিতার ইংরাজি তর্জমা করিয়া তাহার পাণ্ডুলিপি লইয়া একখানা সার্টিফিকেটের জন্য বিলাতে দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া এবং পারিবারিক কথা (সত্য হোক, মিথ্যা হোক) ও নিজের ঋষিত্ব সম্বন্ধে ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিজের কবিতার বহির ভূমিকায় ছাপাইবেন—তাঁহার এই অন্ধভক্তের স্তবে তাঁহার যে এত অবনতি হইবে—তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। ...'

'নায়ক' যে পরিষৎ অর্থাৎ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে অগথা গাধা বানাবার কথা বলে বিদ্রূপ করেছিল, তার প্রসঙ্গটা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড গ্রন্থ থেকে এখানে উদ্ধৃত করছি—

'১৩১৮ সালের প্রবাসী পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় জন্মোৎসব উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর পক্ষ হইতে অভিনন্দন দিবার প্রস্তাব প্রকাশিত হইল। কিন্তু কবির ভাগ্যদোষে বরাবরের ন্যায় এবারও একদল লোক জন্মোৎসবের বিরোধিতা ও কবিকে এই উদ্যোগের প্ররোচক বলিয়া সন্দেহ করিয়া নিন্দাবাদ রটাইতে শুরু করিল। রবীন্দ্রনাথ উৎসবের কয়েকদিন পূর্বে শান্তিনিকেতন হইতে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখিলেন (২১ বৈশাখ)—'আপনারা পরিষৎ হইতে যে উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, একদল তাহার বিরুদ্ধে একখানি পত্র মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিতেছেন।...' তাহার মধ্যে আমার প্রতি যে কটাক্ষপাত আছে, তাহা পড়িয়া বুঝিলাম, আমার চিরন্তন ভাগ্য আমার পঞ্চাশিক জন্মোৎসবেও অবিচলিত আছেন। ভগবানের কৃপায় আমি সত্য মিথ্যা অনেক নিন্দা জীবনে বহন করিয়া আসিয়াছি। আজ আমার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইবার মুখে এই আর একটি নিন্দা আমার জন্মদিনের উপহার স্বরূপ লাভ করিলাম এই যে আমি আত্মসম্মানের জন্য লোলুপ হইয়াছি।... (৪র্থ সং: পৃঃ ৩১৬)

২৩

ওঁ

প্রিয়বরেষু

কলকাতায় এসেছি।
'নিশিদিন হেথায় বসে আছি
তোমার অবসর মত আসিয়ো।'

সোমবার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই চিঠিটি পোস্টকার্ডে লেখা। রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে তারিখ না দিয়ে শুধু

সোমবার লিখলেও দেখেছি—পোস্টকার্ডে ডাকঘরের ছাপ আছে—Calcutta, 27 Oct '13—ঐ ২৭শে অক্টোবর সোমবারই ছিল।

এখানে এই তারিখটি নিয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনার আছে—

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনী গ্রন্থে লিখেছেন—'১৫ অগ্রহায়ণ তিনি [রবীন্দ্রনাথ] কলিকাতায় গেলেন। বিলাত হইতে ফিরিবার দুই দিনের মধ্যেই শান্তিনিকেতনে চলিয়া আসিয়াছিলেন (২২ আশ্বিন)। তার দেড় মাস পরে কলিকাতায় ফিরিলেন।'—২য় খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪৪৯

প্রভাতবাবু তাঁর ওই গ্রন্থের ৪৪৪ পৃষ্ঠায় ইন্দিরা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির অংশ উদ্ধৃত করে লিখেছেন—'এই দু দিনের বিষম উপদ্রবে আজ আমার শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে। তাই আজই (২২ আশ্বিন) বিকেলের গাড়ীতে [বোলপুরে] পালাতে হচ্ছে। নইলে বাঁচব না।' —চিঠিপত্র, ৫ম খণ্ড

এখানে প্রভাতবাবুর লেখায় ২২ আশ্বিন ছিল ৮ অক্টোবর ১৯১৩, আর ১৫ অগ্রহায়ণ ছিল ১ ডিসেম্বর ১৯১৩।

প্রভাতবাবুর মতে রবীন্দ্রনাথ বিলাত থেকে দেশে ফেরেন ২০ আশ্বিন বা ৬ অক্টোবর ১৯১৩। তার দুদিন পরে ২২ আশ্বিন বা ৮ অক্টোবর শান্তিনিকেতনে যান। আবার কলকাতায় ফেরেন 'দেড় মাস পরে' ১৫ অগ্রহায়ণ বা ১ ডিসেম্বর।

প্রভাতবাবুর এ কথাগুলি ঠিক নয়। কারণ রবীন্দ্রনাথ বিলাত থেকে দেশে ফেরেন ১৩ আশ্বিন বা ২৯ সেপ্টেম্বর সোমবার মহালয়ার দিন। ১৯১৩ সালের অক্টোবর মাসের মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত Rabindranath's Return লেখা থেকে জানা যায়—ঐ দিন রবীন্দ্রনাথ হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছলে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত থেকে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন।

কালিদাস নাগের ডায়রি থেকে জানা যায়, পূজার ছুটির আগে শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য কবি ঐদিনই সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনে যান।

১৬ আশ্বিন বা ২ অক্টোবর শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ের পূজার ছুটি আরম্ভ হয়। এরপর রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় চলে আসেন।

রবীন্দ্রনাথ ২৩ আশ্বিন বা ৯ অক্টোবর কলকাতায় থেকে সুধাকান্ত রায় চৌধুরীকে চিঠি লিখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ২৪ আশ্বিন বা ১০ অক্টোবর কলকাতায় থেকে বিহারীলাল গুপ্তকে চিঠি লিখেছিলেন। দ্রঃ দেশ ১৯৬৫, মে ৮, পৃ: ৩২

২৫ আশ্বিন বা ১১ অক্টোবর কলকাতায় থেকে কবি এন্ড্রুজকে চিঠি লিখেছিলেন। দ্রঃ Letters to a Friend. P. 38

রবীন্দ্রনাথ ২৬ আশ্বিন বা ১২ অক্টোবর শান্তিনিকেতনে থেকে আমেরিকা প্রবাসী সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মণকে চিঠি লেখেন। —দ্রঃ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা, পৃ: ৪৬৮

প্রভাতবাবু তাঁর গ্রন্থে ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠি উদ্ধৃত করতে গিয়ে ঐ চিঠির মধ্যে যে '(২২ আশ্বিন)' লিখেছেন, এটা তাঁর নিজের লেখা। রবীন্দ্রনাথের নয়। এমনকী রবীন্দ্রনাথের ওই চিঠিতে কবে লেখা তার তারিখও নেই। এটা অন্য সময়কার লেখা অন্য চিঠি। ১৯১৩র অক্টোবরে বিলাত থেকে ফেরার সময়কার চিঠি নয়।

প্রভাতবাবু যে লিখেছেন—রবীন্দ্রনাথ বিলাত থেকে এসে শান্তিনিকেতনে যাওয়ার দেড় মাস পরে সেখান থেকে ১৫ অগ্রহায়ণ বা ১ ডিসেম্বর কলকাতায় এসেছিলেন, এটাও ঠিক নয়। কারণ, সীতা দেবী লিখেছেন—২৫শে নভেম্বর (১৯১৩) বিকালের দিকে কবি হঠাৎ আমাদের বাড়ি আসিয়া উপস্থিত। —পূণ্যস্মৃতি, পৃঃ ৬৬

আর দ্বিজেনবাবুকে লেখা এই চিঠি থেকেও দেখা যাচ্ছে—কবি ২৭শে অক্টোবর (১০ কার্তিক) কলকাতায় আছেন।

আলোচ্য চিঠিতে আমার দেখা পোস্ট অফিসের তারিখের ছাপকে ভুল বা সন্দেহজনক মনে করে কেউ রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতবাবুর লেখাকেই সঠিক ভাবতে পারেন, এই ভেবেই এ নিয়ে এখানে একটু বিস্তৃত আলোচনা করলাম।

৩

২৪

[২৪ ফেব্রুয়ারি (?) ১৯১৪]

শিলাইদা
নদিয়া

প্রিয়বরেষু,

পত্র পাইলাম। সেদিন সত্যজ্ঞানবাবুকে[১] দেখিতে যাই নাই বলিয়া আপনি এবং মেনার্ড সাহেব[২] ক্ষোভ ও বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন।

আমার স্বভাবে একটা গ্রন্থি আছে—একটা কেন অনেকগুলা, ইহাও তাহার মধ্যে একটি—আমি হাঁসপাতালের রোগীশালায় যাইতে একান্ত কষ্ট বোধ করি। একবার মনোরঞ্জনবাবুকে দেখিতে জেনেরাল হাঁসপাতালে যাইতে হইয়াছিল, তাহাতে অত্যন্ত পীড়া বোধ করিয়াছিলাম। সেখানে আমার যাওয়ার প্রয়োজন ছিল কারণ মনোরঞ্জনবাবু সেখানে আত্মীয় বান্ধবহীন ছিলেন এবং তাঁহাকে আমি কতকগুলি পড়িবার বই প্রভৃতি দিয়া আসিয়া ছিলাম। নতুবা নিরর্থক লৌকিকতা আমার আসে না। আমি একলা রোগীর শুশ্রূষা অনেক করিয়াছি এবং মৃত্যু আমার কাছে সুপরিচিত। কিন্তু যেখানে হাঁসপাতাল ঘরে বহু রোগীকে একঘরে রাখিয়া দেয়, সেখানে সেই দৃশ্য আমার কাছে কতই বেদনাজনক তাহা সহজে কেহ বুঝিবে না। এই কারণেই জেলখানায় আমি দর্শকরূপে যাইতে অত্যন্ত অনিচ্ছা ও ক্লেশ বোধ করি। স্কুলও আমার কাছে অনেকটা এই কারণেই কুৎসিত। মানুষের কষ্টের পশ্চাতে যেখানে আত্মীয়তার background নাই যেখানে কেবলমাত্র একটা ব্যবস্থার ঝাঁকার মধ্যে অনেকগুলা লোক একত্রে আবদ্ধ হইয়া থাকে সেখানকার অস্বাভাবিকতা আমার কাছে অত্যন্ত পীড়াকর। অথচ সমাজ যখন জটিল হইয়া উঠে তখন এরূপ প্রতিষ্ঠানগুলি অত্যন্ত আবশ্যক।

সুতরাং ইহার কল্যাণকরতা আমি কিছুমাত্র অস্বীকার করি না—কিন্তু এরূপ জায়গায় আমার উপস্থিতি যথার্থই প্রয়োজনীয় না হইলে আমি যাইতে পারি না। আপনাদের ওখানে যখন আমি যাই তখন আমি আপনাদের এক তলার বড় ঘরটার আশে পাশে দৃষ্টিপাত-মাত্র করিতে পারি না। মানুষের রোগ ও কষ্টের একটা আব্রু আছে, সেইটে ঘুচিয়া গেলে তাহার মত শোচনীয় আর কিছু নাই। বস্তুত এই দৃশ্যে আমার নিরতিশয় সঙ্কোচ হয়। কারণ ইহার মধ্যে একটি দৈন্য আছে—দায়ে পড়িয়া এটি মানুষকে স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু এ আমি চোখে দেখিতে পারি না। আমার এই সঙ্কোচকে আপনারা কবিত্ব বলিতে পারেন দুর্ব্বলতা বলিতে পারেন, কিন্তু ইহা আমার আছে, তাহা কবুল করিলাম। যদিচ কবুল করিলেই দোষের ক্ষালন হয় না, তবু কিছু লাঘব হয়—এ সম্বন্ধে আমি ঐটুকুর বেশি আশা করি না।

কিছু দিন নির্জ্জন চরে আরামে ছিলাম। আবার পাবনা সাহিত্য সম্মিলনে টানিয়া আনিয়াছে। আবার পদ্মার জলচর জীবদের প্রতিবেশী হইবার জন্য চলিলাম। তাহাদের গুণ এই, তাহারা আমাকে কবি বলিয়া কেয়ার করে না, অকবি বলিয়া গাল দেয় না—তাহারা আমাকে মানুষ মাত্র বলিয়া একঘরে করিয়া রাখে—তাহাতে নিরুপদ্রবে থাকিতে পারি। ইতি—তারিখ ঠিক জানি না। ফাল্গুন ১৩২০

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. সত্যজ্ঞানবাবু বা সত্যজ্ঞান চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড গ্রন্থে লিখেছেন—

'১৩১৮ সালের চৈত্র শেষে বিধুশেখর ভট্টাচার্য শান্তিনিকেতন ছাড়িয়া নিজগ্রাম মালদহের হরিশচন্দ্রপুরে প্রাচীন ভারতের আদর্শে গুরুগৃহ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে গেলেন। তাঁহার স্থলে সংস্কৃত পড়াইবার জন্য আসিলেন এলাহাবাদ হইতে সত্যজ্ঞান চট্টোপাধ্যায়—বিপত্নীক, সঙ্গে বিধবা কন্যা ও তাঁহার শিশুপুত্র সূর্য। শান্তিনিকেতন গুরুপল্লীর এক পাশে 'সূর্যির মা'র বাড়ি' এখনো আছে। সূর্য বহুকাল মৃত। তাহার বৃদ্ধা মাতা, বিধবা পত্নী ও সন্তানাদির সংবাদ আজ অজ্ঞাত।'

২. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রজীবনী গ্রন্থে লিখেছেন—'মেয়ো হাসপাতালে সত্যজ্ঞান চট্টোপাধ্যায় নামে শান্তিনিকেতনের জনৈক শিক্ষক পীড়িত হইয়া কালাতিপাত করিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ হাসপাতালের উপরতলার মজলিসে যাওয়া আসা করিতেন; কিন্তু কোনো দিন সত্যজ্ঞানকে দেখিতে যান নাই বলিয়া হাসপাতালের ইংরেজ অধ্যক্ষ ডাঃ মেনার্ড দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে ক্ষোভ ও বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ডাঃ মৈত্র এই কথাটি কবিকে জানান।' —২য় খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৪৫৪।

কবি দ্বিজেনবাবুর কাছ থেকে এ সম্পর্কে চিঠি পেয়ে তখন শিলাইদহ থেকে দ্বিজেনবাবুকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন।

২৫

৮ অগস্ট ১৯১৪ শান্তিনিকেতন

ওঁ

প্রিয়বরেষু,

রবিবার রাত্রে রাজধানীতে পদার্পণ করব। একবার দেখা সাক্ষাতের উদ্যোগ করবেন।

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই চিঠিতে পোস্টকার্ডে শান্তিনিকেতন ডাকঘরের ছাপ আছে ৮ অগস্ট ১৯১৪।

২৬
[১২ নভেম্বর, ১৯১৩] ওঁ
প্রিয়বরেষু,

এই ত বেশ কথা। আপনার খোলা ছাত আছে, খোলা প্রাণ আছে, আমরাও আছি, এই ত সভার মত সভা। সমাজের ভিতরের মধ্যে আমাকে দাঁড় করিয়ে কৌতুক করবার দরকার কি?।

তার পরে ঐ যে ব্রাহ্ম সমাজের সমস্ত বিরোধ টিরোধসুদ্ধ[১] সমস্ত সামগ্রীটাকে সিদ্ধিঘোঁটা করে একটা পিণ্ড পাকাবার ভার আমাকে দিতে চান আমার সে রকম শক্তির কি পরিচয় পেয়েছেন আমাকে বলেন ত? বাঁশির দ্বারা কোনদিন ঢেঁকির কাজ হয়েছে আপনি মানবের ইতিহাসে তার কোনো পরিচয় পেয়েছেন কি? যদি আমার কণ্ঠে সুর না ফুরিয়ে থাকে তবে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত গান গাব আমার ভাগ্যবিধাতার সঙ্গে আমার এই রকম একটা বোঝাপড়া আছে—তাতে যেটুকু কাজ বা অকাজ হতে পারে আমার দ্বারা তাই হবে—এইটুকুমাত্র যারা আমার কাছে আশা করে তারাই blessed, for they in wise shall be disappointed। আমি যেটুকু দলকে মানি সে হচ্চে সরস্বতীর শতদল। সম্প্রদায়ের দলাদলির মধ্যে রস কোথায় আছে আজো তার সন্ধান পাইনি—এই কারণে সেই কাঁটাবনকে আমি দূরে পরিহার করে চলি। —কিন্তু আপনি মেয়ো হাঁসপাতালে তলিয়ে আছেন, আর আমি আছি এই প্রান্তরে। এই বিচ্ছেদটি আমি মেটাবার জন্যে একান্ত উৎসুক একথা নিশ্চয় জানবেন। ইতি বুধবার

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. ১৯১১ খৃস্টাব্দে আদমসুমারীর সময় ব্রাহ্মসমাজের একাংশ স্থির

করেন, তাঁরা লোকগণনাকালে নিজেদের ধর্ম 'ব্রাহ্ম' বলে লেখাবেন। অপরাংশ স্থির করেন 'হিন্দু' বলে লেখাবেন।

প্রথমোক্ত দলের অভিমত ছিল—'ব্রাহ্মধর্ম বিশ্বজনীন ধর্ম, পৃথক ধর্ম—এখানে হিন্দু ছাড়া মুসলমান খৃস্টানরাও আশ্রয় পায়। এই ধর্ম বিশেষ কোনো ধর্মগ্রন্থ, বিশেষ কোনো মহাপুরুষের বাণী কেন্দ্র করিয়া আবির্ভূত হয় নাই। সকলের জন্য যখন ইহা উন্মুক্ত তখন ইহাকে হিন্দুধর্মের সম্প্রদায় বা ব্রাহ্মদিগকে হিন্দু আখ্যা দেওয়া যায় না—ব্রাহ্ম ব্রাহ্মই।'

শেষোক্ত দলে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এ সম্পর্কে তাঁর নিজের বক্তব্য ছিল—'আমি হিন্দু সমাজে জন্মিয়াছি এবং ব্রাহ্মসমাজকে গ্রহণ করিয়াছি। আমরা যে ধর্মকে গ্রহণ করিয়াছি তাহা বিশ্বজনীন, তথাপি তাহা হিন্দুরই ধর্ম।'

এই সময় ব্রাহ্মসমাজের ছাত্রদের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের এক সভায় 'আত্মপরিচয়' নামে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাতেও তিনি নিজের 'ধর্ম' সম্বন্ধে তাঁর পূর্বোক্ত মতই ব্যক্ত করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের এই 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধ তখনকার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হলে (বৈশাখ ১৮৩৪ শক বা ১৩১৯ বঙ্গাব্দ), সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্বকৌমুদি'তে এর বিরূপ সমালোচনা হয়। রবীন্দ্রনাথ পরের মাসের 'তত্ত্ববোধিনী'তে 'হিন্দুব্রাহ্ম' নামে এক প্রবন্ধ লিখে 'তত্ত্বকৌমুদি'র সমালোচনার উত্তর দেন। এই নিয়ে তখন ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে একটা দলাদলির মত সৃষ্টি হয়েছিল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ছাত্র ও তরুণরা রবীন্দ্রনাথের সমর্থক ছিলেন। ১৯১৩ খৃস্টাব্দে এই ছাত্র ও তরুণরা রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি করবেন স্থির করেন। এই তরুণ দলের অন্যতম ছিলেন ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র। দ্বিজেনবাবু তাঁদের অভিলাষের কথা রবীন্দ্রনাথকে জানালে, রবীন্দ্রনাথ তখন চিঠিতে দ্বিজেনবাবুকে এই কথা লিখেছিলেন।

২৭
২২ জুলাই ১৯১৪

ওঁ

প্রিয়বরেষু,

আপনার স্পর্দ্ধা ত বড় কম নয় দেখছি! আপনি জগদ্বিখ্যাত লোকদের যখন তখন চিঠিপত্র লিখতে সাহস করেন। জগদ্বিখ্যাত লোকটি হয়ত আপনাকে কোনো একদিন মাপ করতেও পারেন যদি ইতিমধ্যে ঘন ঘন পত্রাদি লিখে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকেন—আপনার একখানা পত্রের অপরাধ একশোখানা পত্র দিয়ে যদি মুছতে পারেন, তাহলেও জানবেন খুব অল্পের উপর নিষ্কৃতি পেলেন। আমাকে বাইরে থেকে দেখে আপনারা যতটা ভাল মানুষ মনে করেন ততটা নই এটা নিশ্চয় জানবেন। ইতি ৬ই শ্রাবণ ১৩২১

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮
৭ আগষ্ট ১৯১৪

ওঁ

প্রিয়বরেষু,

দিন দুয়েকের মধ্যেই কলকাতায় যাব, তখন ঝুনুর[১] জন্যে বই দেব। তখন দেখা সাক্ষাৎ আলাপ আলোচনারও সুযোগ নিশ্চয় হবে। সুইড রমণী এখানে এসেছিলেন—বোধ হচ্ছে খুসি হয়েই ফিরেছেন। একটি আমেরিকানের অভ্যুদয় হয়েছিল, তিনি পুনর্ব্বার আসবার জন্যে অভিলাষী।

ব্রজেন্দ্রবাবু[২] তাহলে ফিরেছেন। না ফিরলে হয়ত কোনো এক পক্ষের সেনাপতিত্বে[৩] তাঁকে পাকড়াও করত। কেন না যুদ্ধবিদ্যা বিস্তারিতভাবে তিনি যে জানেন না এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা করা চাই। ইতি ২২ শ্রাবণ ১৩২১

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. ঝুনু হলেন সাহানা দেবী। ইনি দ্বিজেনবাবুর আত্মীয়া ছিলেন।

২. ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

৩. এই চিঠি লেখার ৩ দিন আগে ১৯শে শ্রাবণ ১৩২১, ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ব্রজেনবাবু এর অনেক আগেই ইউরোপে গিয়েছিলেন।

২৯

হৈমন্তী
রামগড়
কুমায়ুন

ওঁ

প্রিয়বরেষু,

হিমাচলের কোলে আছি ভাল। একটু বেশি পরিমাণে সুশীতল। আপনাদের মত দুচার জন বন্ধুবান্ধব থাকিলে সরগরম হইতে পারিত।

মুকুল আমাদের সঙ্গে আছে। তার একান্ত ইচ্ছা Ambulance দলে জুটিয়া চলিয়া যায়। ইহাতে আমার সায় আছে। তাহার কারণ এইরূপ Adventureএর ভিতরে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া যদি ফিরিয়া আসে, তবে ও মানুষ হইয়া আসিবে। নহিলে ওর যেটুকু শক্তি আছে তাহা নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া থাকিবে। আমাদের দেশের লেখক ও আর্টিষ্টরা জীবন সমুদ্রের ঢেউ খায় না বলিয়া কেমন এক রকমের নির্জীব পদার্থের সৃষ্টি করিয়া থাকে। য়ুরোপে সম্প্রতি যে

সুযোগের সৃষ্টি হইয়াছে ইহার মধ্যে আমাদের বহু সংখ্যক যুবকের এখনি চলিয়া যাওয়া উচিত। তাহা হইলে আমরা দেশের মধ্যে একদল মানুষ পাইব। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা এই অধ্যবসায়ে আমাদের যুবকদিগকে কেবল বাধাই দিয়া থাকি। একে ত তাহাদের নিজেরই মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে সুবুদ্ধি আছে তাহার উপরে আবার আমাদের ঠাণ্ডা বুদ্ধি বাহির হইতে যোগ করিয়া কলিযুগের আর এক মনুসংহিতা রচনা করিতেছি। দুঃসাহসকে প্রশ্রয় দেওয়া চাই—এইজন্য আমি কোনো যুবককে এই কাজে নিরস্ত করি না।

এক্ষণে আপনি দয়া করিয়া মুকুলের জন্য কি করিতে হইবে, এই অভিযানের কি কি সর্ত্ত, কত দিনের মেয়াদ শীঘ্র জানাইবেন। মুকুলের বয়স উনিশ, অসম্ভবরূপে খাইতে পারে এবং তাহা আশ্চর্য্যরূপে হজম করিতেও পারে। ...ডাকের সময় যায় যায়—অতএব আজ এই পর্য্যন্ত।

কথাটা কাহাকেও বলিবেন না।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠিটিতে চিঠি লেখার তারিখ নেই। আর যে খামের ভিতর চিঠিটি পাঠিয়েছিলেন, সেই খামটিও পাওয়া গেল না। পাওয়া গেলে খামের উপর ডাকঘরের স্ট্যাম্পের ছাপ দেখে তারিখটা অনুমান করা যেত। তবে চিঠিতে দেখা যাচ্ছে, কবি রামগড় থেকে চিঠিটি লিখেছিলেন। কবির এই রামগড়ে অবস্থান প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী' ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ গ্রন্থে লিখেছেন—

'খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিয়া নৈনিতালের নিকট রামগড় নামক স্থানে এক সাহেবের ফলের বাগান ও বাড়ি রথীন্দ্রনাথ হঠাৎ কিনিয়া বসিলেন। ...রথীন্দ্রনাথের ইচ্ছা গ্রীষ্মকালে পিতা মাঝে মাঝে পাহাড়ে গিয়া বাস করেন।

...অচলায়তন অভিনয়ের পরদিন কবি কলিকাতায় যান এবং সেখান হইতে দুই-একদিনের মধ্যেই রামগড় যাত্রা করেন (মে ১৯১৪)। সঙ্গে প্রতিমা দেবী ও মীরা দেবী। রথীন্দ্রনাথ তখন বদরিকাশ্রম হইতে ফিরিবার পথে। বিদ্যালয় বন্ধ হইবার কয়েকদিন পূর্বে রথীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ, নেপালচন্দ্র রায়, শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী, নেপালী ছাত্র নরভূপরাও বদরিকাশ্রম দর্শনে গিয়াছিলেন। ফিরিবার পথে ইঁহারা রামগড় হইয়া আসিলেন।...' পৃঃ ৪৬৩

প্রভাতবাবু আরও লিখেছেন—কবি রামগড়ে কেনা ওই নতুন বাড়ির নাম দিয়েছিলেন 'হৈমন্তী'।

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিতে যে মুকুলের কথা আছে, তিনি হলেন পরবর্তীকালের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী—মুকুল দে। প্রভাতবাবু তাঁর গ্রন্থে কবির রামগড়ে অবস্থানের কথা লিখতে গিয়ে কোথাও এই 'মুকুলের' কথা উল্লেখ করেন নি। অথচ কবির চিঠি থেকে দেখা যাচ্ছে, মুকুল তখন কবির কাছে রামগড়ে ছিলেন। অনুমান হয়, কবি পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী এবং কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার সময় এই মুকুলও তাঁদের সঙ্গে গিয়েছিলেন।

প্রভাতবাবু লিখেছেন—জুন মাসের মাঝামাঝি (১৯১৪) রবীন্দ্রনাথ সপরিজন রামগড় পাহাড় ত্যাগ করেন। —এখন বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ ১৯১৪র মে অথবা জুন মাসে কোনো এক সময়ে দ্বিজেনবাবুকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল—৪ঠা অগস্ট ১৯১৪ থেকে ১১ই নভেম্বর ১৯১৮ পর্যন্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক আগে ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রই যখন পরস্পর শত্রুতায় ও নিজ নিজ শক্তি বৃদ্ধিতে মগ্ন, সেই সময়ে ইংরাজ নিজেকে তৈরি রাখবার জন্য তার রাজ্য মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স বাহিনী গঠন করছিল। ওই অ্যাম্বুলেন্স বাহিনীতে মুকুলের যোগদানের আগ্রহ থাকায়, তখন এই নিয়েই রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেনবাবুকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন।

৩০

১২ সেপ্টেম্বর ১৯১৪

ওঁ

প্রিয়বরেষু,

সৃষ্টি যে ভাঙাগড়ার নৃত্য ভাঙনও যে সৃষ্টিরই অঙ্গ। আমার উপর দিয়ে কিছুকাল থেকে ভাঙার মার চলেছে বটে কিন্তু সে যে নতুনকে গড়ে তোলবার জন্যে সুতরাং এ মারকে মাথা পেতে নিতেই হবে। আমার জন্যে ভয় করবেন না।

আপনারা সব দল বেঁধে চলেছেন শুনে মনের মধ্যে পথের ডাক ডেকে উঠেছে—এক একবার মনে হচ্চে সব ফেলে দিয়ে আপনাদের সঙ্গে জুটে যাই—একবার পথের ধুলোয় রাঙা হয়ে ফিরে আসি। আবার ভাবচি, চুপ করে থাকি, দেখি ভিতরে কি কাণ্ডটা হচ্চে—গ্যাসগুলো জ্বলতে জ্বলতে কেমন করে জ্যোতিষ্ক সৃষ্টি করে একবার দেখে নেওয়া যাক। তাছাড়া দেশ বিখ্যাত হবার মুষ্কিল এই যে দেশের মধ্যে বেরবার জো নেই—অতএব আমার অজ্ঞাতবাসের মেয়াদ পাণ্ডবদের মত কেবল এক বছরের নয়—এ চির জীবনের। আমাকে সঙ্গে নিলে আপনারাও আরাম পাবেন না—সমস্ত পথ কেবলি ভিড় ঠেলে চলতে হবে। এই সমস্ত চিন্তা করে শান্ত হয়ে বসে রইলুম। আপনাদের যাত্রা শুভ হোক সুখের হোক। ইতি ৮ই আশ্বিন ১৩২১

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩১
২৬ জানুয়ারি ১৯১৫

ওঁ

প্রিয়বরেষু,

আমার ছাত্র শ্রীমান হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তারি শিখিবার চেষ্টায় আছে, কিন্তু মেডিকাল কলেজে প্রবেশ লাভ করা অত্যন্ত কঠিন, এই জন্য আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আপনি যদি কোনো সুযোগে ইহাকে ভর্ত্তি করাইয়া দিতে পারেন, তবে আমি আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। ইতি ১২ই মাঘ ১৩২১

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩২
৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ — শিলাইদা

ওঁ

প্রিয়বরেষু,

আমি যে একদিন হাটের মধ্যে ঘোষণা করে দিয়েছি যে, 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর' সে কথাটা বুঝি কিছুতেই আপনারা কানে তুলবেন না? আপনি যাই বলুন আমি একটি অক্ষরও লিখতে পারব না—আমি এ কয়দিন ইস্কুল পালিয়েছি আমার Exercise books সমস্ত সহরে ফেলে এসেছি—আমি হিতসাধনে[১] মন দিতে পারব না। আমি ইস্কুল মাষ্টারকে ফাঁকি দেবই। সেদিন আমাকে মাচার উপরে দাঁড় করিয়ে দেবেন, ভাল মন্দ মুখ দিয়ে যা বেরয় তাই বলে খালাস হব—আমার বাক্য মানস সরোবর থেকে সাদা রাজহাঁসের মত আকাশে ছুটে চলবে—ছাপার কালীতে

কালো হয়ে দাঁড় কাকের মত ছাদের উপর দল বেঁধে পাড়ার কানে তালা ধরিয়ে দেবে না।

আপনাদের কার্য্যতালিকার মধ্যে আমাকে খুব একটুখানি ছোট স্থান দেবেন—কারণ আপনার ভালবাসার মধ্যে আমি যতটা জায়গা অধিকার করি না এ রকম সভামঞ্চে আমার স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। আপনার ডাক কোনো মতে এড়াতে পারলুম না বলেই ধরা দিলুম, কাজের ডাক আমার চিত্তে পৌছয় নি—কারণ, আমার মনিব আমার কাজ বরখাস্ত করে দিয়েছেন, এখন তাঁর খাষ মহলে তিনি আমাকে তলব করেছেন। একথা বললে লোকে বিশ্বাস করবে না, কিন্তু না করলে আমি নাচার।

ভেবেছিলুম রবিবার রাত্রে ছেড়ে সোমবার পৌঁছব কিন্তু.আমার ছুটির মেয়াদ থেকে দু-দুটো গোটা দিন আপনার সার্জ্জারির ছুরি চালিয়ে একেবারে গোড়া ঘেঁষে ছেঁটে ফেল্লেন? দয়ামায়া কিছুই নেই? জীবনে ছুটির দিন যে সব চেয়ে দুর্লভ। এ দিনগুলি যে আমার পক্ষে কি এবং কতখানি তা যদি বুঝতেন তাহলে এই ব্রাহ্মণকে আর কিছু দান না দিয়ে এই দিনগুলি দান করে অক্ষয় পুণ্যলাভ করতেন।

তাছাড়া বক্তৃতার সঙ্গে একটা কবিতা জুড়তে হবে এ আপনার কি রকম ফরমাস? এ বসন্তকালে কি এই রকমের ভয়ঙ্কর অসবর্ণ বিবাহ আপনারা ব্রাহ্মমতে পছন্দ করলেন? কিন্তু এ ঘটকের দ্বারা এমন অধর্ম্ম হবে না। আমার শক্তি নেই।

যে মানুষ সত্যই যা তাকে তাই বলে মেনে নিতে দোষ কি? যেখানে সে খাপ খায় না সেইখানে গোঁজামিল দিয়ে পৃথিবীতে যে কত অপকার্য্য হয়েছে তা কি একটা হিসেব রেখেছেন? আমাকে নিতান্তই একটা অপদার্থ কবি বলে স্বীকার করতে আপনার বাধা

হচ্ছে কিসের? চামেলি ফুলের ডাল দিয়ে কি রেলগাড়ির চাকা তৈরি হয়? যদি সময় পান তবে এইগুলো একটু চিন্তা করবেন—যদি সময় না পান এবং চিন্তা না করেন, তবে অন্তত আমি জাপানে চলে যাওয়া পর্য্যন্ত এই সমস্ত কাজ মুলতবি রাখবেন।

যাই হোক বিদায় হে খোলা আকাশের কোলাকুলি, বিদায় হে বসন্ত বাতাসের সুগন্ধি চুম্বন, বিদায় হে নিভৃত পদ্মাতীরের কলমুখর চক্রবাক্ সভা—আমি যাব শনিবার দিন ছ'টার সময়, কলকাতার সভায় বক্তৃতা করব হাততালি নেব এবং তারপরে যা কপালে থাকে তা হবে। ভয় করবেন না—কবি বলে একেবারে নিতান্ত বেইমান নই—কথা দেব বলে আপনাকে কথা দিয়েছি, সেদিন কিছু কথা দিয়ে আসব[১] এটুকু স্থির, কিন্তু তার বেশি আর কিছু না। ইতি ২১ মাঘ ১৩২১

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড গ্রন্থ থেকে জানা যায়—

১২ মাঘ ১৩২১ (২৬ জানুয়ারি ১৯১৫) কলকাতায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর আলোচনা সভা আহূত হয়েছিল। সভায় প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আলোচনার অবতারণা করেছিলেন।

পরে ১ ফাল্গুন (১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫) বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর উদ্‌বোধন সভার অধিবেশন হয়। সেই সভায় সভাপতি ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী, সভায় রবীন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ডাঃ নীলরতন সরকার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তৃতা দেন।

সেই সভায় রবীন্দ্রনাথ যে মৌখিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তারই সারমর্ম 'কর্মযজ্ঞ' নামে পল্লীপ্রকৃতি গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। হিতসাধনমণ্ডলী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র।

৩৩
[১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬] শিলাইদা

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আপনারা দেশের উপকার করতে চান অথচ মানুষের প্রতি আপনাদের দয়ামায়া কিছুমাত্র নেই। আমার মরবার বয়স হয়েচে এখন আমাকে মারেন কেন—যমরাজের উপর বরাৎ দিলেই তাঁর কাজ তিনিই সুসম্পন্ন করবেন।

একটা জিনিস বার বার পরীক্ষা করে স্পষ্ট বুঝতে পেরেচি যে পাব্লিকের সামনে দাঁড়াবার মানুষ আমি নই। ওতে কেবল যে আমার মানসিক শক্তির অপব্যয় হয় তা নয় শারীরিক শক্তিরও। দশের কাজ যদি আমাকে করতে হয় সে দশের সংসর্গ বাঁচিয়ে। আমার আত্মরক্ষার একটি মাত্র উপায় আমি দেখতে পাচ্চি আপনাকে দূরে রক্ষা করা।

নিজের সম্বন্ধে আমার কোনো অভিমান আছে তা মনে করবেন না, কিন্তু সে জন্যেই আমি বরাবর ঠকে এসেচি। এখন আর আমার বেশি সময় হাতে নেই এখন আর আমি নিজেকে মুঠো মুঠো করে ভিড়ের মধ্যে হরির লুঠ দিতে পারব না। এখন আমাকে একটুখানি পাশের দিকে নিরালায় সরে দাঁড়াতে হবে।

অতএব সভাপতি হবার মত[১] একে আমার সামর্থ্য নেই, তার উপরে আমার সাবধান হবার সময় হয়ে এসেচে। নিজের সীমানাটা এখন ঠিক করে নিয়ে তার মধ্যেই মাথা গুঁজে দিন কাটানোই হচ্চে এখন আমার পক্ষে সঙ্গত। আমি কোন রকম ঘেঁষাঘেঁষি ঠেলাঠেলি কিছুতেই আর সইতে পারব না সুতরাং এখন আমাকে সভা বাঁচিয়ে চল্‌তে হবে। বারুণী স্নানের যোগে

এক একজন হতভাগ্য যেমন ভিড়ের ঠেলায় ডুব জলে গিয়ে মরে আমার সেই দশা হয়েচে। আমি অত্যন্ত সহজে নানা জনের চাপের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিলুম, এখন দেখচি হাঁপিয়ে উঠেচি, যেমন করে পারি সরতে হবে।

সেই সরবার পণ যখন মনে আঁটচি ঠিক এমন সময়ে আপনার চিঠি পেয়ে ডরিয়ে উঠেচি—দোহাই আপনার, আমাকে ছুটি দিতেই হবে। আমাদের দেশে ধর্ম্মযুদ্ধের নিয়ম হচ্চে এই যে, যে ব্যক্তি পড়ে গিয়েচে তাকে মারতে নেই। আমি পড়ে গিয়েছি। এখন সংসারের যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে আমাকে অন্য ক্ষেত্রে যেতে হবে।

হিতসাধনমণ্ডলীর যে কর্ত্তব্য তালিকা দিয়েছেন, সে আমি মনের সঙ্গে অনুমোদন করি। লেগে যান কাজে। যদি পরামর্শের প্রয়োজন হয় আমার কাছে গোপনে আস্‌বেন—সভার বাহিরে—যে ঋতুতে চুল পাকায় সে ঋতুর প্রধান ফসল হচ্চে পরামর্শ।

পদ্মার শুভ্রচরে বাস করচি। দেখ্‌চি এইখানেই আমাকে মানায় ভাল—একেবারে শাদায় শাদা। এখানে একদল হাঁস আছে—তারা নিজেরাই কলরব করে, আমাকে কোনোদিন কিছু বল্‌তে অনুরোধ করে না—সেই জন্যে তাদের সঙ্গে আমার বেশ বন্‌চে।

আজ শুক্ল পক্ষের চন্দ্রালোকে আকাশ উপচে পড়চে—এখন যদি কেরোসিন ল্যাম্পের হাতে ধরা দিই, তাহলে সেটা অত্যন্ত অবৈধ হবে অতএব এইখানে বিদায়। ইতি ২ ফাল্গুন

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. ১৯১৫ খৃস্টাব্দের ৭ই মার্চ তারিখে বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর সভ্যগণের এক সাধারণ সভায় রবীন্দ্রনাথ এই মণ্ডলীর অন্যতম সহকারী সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন।

৩৪

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬ শান্তিনিকেতন

ওঁ

প্রিয়বরেষু

টাকাটা[১] যাতে আপনার হাতে গিয়ে পড়ে সে জন্যে আজই গগনকে[২] চিঠি লিখে দিচ্ছি। বোধ হয় কোনো বাধা হবে না। তাঁরই হাতে ওটা জমে আছে—আপনিও একবার দরজায় ঠেলা মারবেন। কাল রাত্রে একটা চিঠি লিখেচি তাতে আমার কুশল সংবাদ বিস্তারিত পাবেন—আগামীতে আপনার কুশল জানিয়ে আমার চিন্তা দূর করবেন। ইতি ৩ ফাল্গুন ১৩২২

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ বা বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর মুখপত্র ছিল—চলতি জগৎ। ১৯৭৭ এর ১লা মে তারিখের এই কাগজে 'রবীন্দ্রনাথ ও বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ' নামে একটা লেখা প্রকাশিত হয়েছিল।

ছদ্মনামী লেখক দাঃ মুঃ তাঁর রচনার ভূমিকায় লেখেন—'১৯১৫ সালে বাঁকুড়ায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। এই দুর্ভিক্ষের কথা ও রবীন্দ্রনাথের অবদান বিষয়ে আমরা এখানে আলোচনা করছি। এই লেখার যাবতীয় উপাদান বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগের পুরোনো নথি থেকে নেওয়া।'

এরপর লেখক তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন—'১৯১৩ সালে বাঁকুড়ায় দামোদরের বন্যা হয়। ১৯১৪ সালের ভাদ্র মাসেই বর্ষা শেষ। ফসল ভাল হয় না। তাছাড়া ১৯১৫ সালে অনাবৃষ্টি। সব মিলে বাঁকুড়ায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ নেমে আসে। ১৩২৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকা থেকেও একথা জানতে পারছি। সেখানে লেখা আছে—'বাঁকুড়া জেলায় লোকসংখ্যা ন্যূনাধিক ১১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৬ শত ৭০। তন্মধ্যে প্রায় ৮ লক্ষ দুর্ভিক্ষ পীড়িত হইয়াছে।

১৯১৫ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর বঙ্গবাণী পত্রিকা থেকে জানতে পারি, বাঁকুড়ার অনেক স্থানেই এখনও অন্নকষ্টের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত প্রবল। বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ প্রভৃতি আর্তব্যক্তিগণের সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহার সেক্রেটারী ডাক্তার ডি. এন. মৈত্র বলিতেছেন—এ লীগ সপ্তাহে কিঞ্চিদধিক পাঁচ হাজার আর্তব্যক্তিগণকে দান করিতেছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বসে থাকার মানুষ নন। তিনিও সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। বেঙ্গলী নামে একটি ইংরেজি কাগজ তখন বের হত। ঐ পত্রিকার ১৯১৬ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা থেকে অনেক কিছু জানতে পারি। রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ সালের ২৯শে ও ৩১শে জানুয়ারি 'ফাল্গুনী' নাটক অভিনয় করান। নিজেও তিনি অভিনয় করেছিলেন। ২৯শে জানুয়ারি টিকিট বিক্রির আয় হয় ৬০০৮ টাকা। ৩১শে জানুয়ারি দুপুর বেলা নাটক অভিনয় হয়। ঐ দিন আয় হয় ১৯৪২ টাকা। এ ছাড়া তাঁরা 'ফাল্গুনী' নাটকের সংলাপও বিক্রি করেন। তার থেকে আয় হয় ২২২ টাকা। নাটক অভিনয়ের জন্য ১০৩০ টাকা খরচ হয়। এর যাবতীয় খরচা বহন করেন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯১৬ সালের ১৮ই মার্চ, ইংরাজি অমৃত বাজার পত্রিকায় ডাক্তার ডি. এন. মৈত্রকে কত দান করেন তার হিসাব একটি চিঠি মারফৎ দেন। তা থেকে জানতে পারি 'ফাল্গুনী' নাটক অভিনয় করে রবীন্দ্রনাথ ৭০০০ টাকা বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগকে দান করেন।'

২. গগন—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৫
২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫

[সুরুল
শ্রীনিকেতন]

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আপনি বিষম ব্যস্ত আছেন জানি তবু একটু ঠাণ্ডা হয়ে আমার এই চিঠিখানা আগাগোড়া পড়ে নেবেন।

আগামী বৃহস্পতিবারে বারাকপুরে ভাইসরয়ের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছি। সে নিমন্ত্রণে আমি যেতুম কারণ, লর্ড হার্ডিঞ্জের পরে আমার ভক্তি আছে।[১]

কিন্তু ইতিমধ্যে আমার স্কন্ধে কবিতা ভর করেছেন। আমার আশ্রমের ছেলেবুড়ো সবাই ধরেছে বসন্ত উৎসবের উপযোগী একটি ছোট নাটক রচনা করে দিতে হবে। আমি কথা দিয়েছি এবং সুরুলের নির্জ্জন ঘরে লিখ্‌তে বসে গেছি।[২] গানের সুরগুলো মস্তিষ্কের মৌচাকটার মধ্যে গুন্ গুন্ করতে লেগে গেছে। ইতিমধ্যে বুধবারে যদি এখান থেকে বেরতে হয় এবং তার পরে আপনার রবিবার সারতে হয়, তাহলে আমার রসের যজ্ঞ ভঙ্গ হবে। আমার লেখাটার গোটা চার পাঁচ কটি ডাল বেরতেই তাকে একেবারে ছাগলে খাওয়ার মত দশা করবে। তাতে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি না হতে পারে কিন্তু কবির পক্ষে সেটা উপাদেয় নয়।

ভাইসরয়কে লিখে দিলুম আমি এখানকার কাজে আছি অতএব দুঃখের সঙ্গে ইত্যাদি ইত্যাদি। তার দুদিন পরেই কলকাতায় বক্তৃতা দিতে গেলে আর কিছু না হোক্ বেজায় রকম রূঢ়তা হবে।

অতএব আস্‌চে রবিবারে রবিকে বাদ দিতে হবে। লাফিয়ে উঠ্‌বেন না। কথাটা বুঝে দেখুন। আপনার এই কন্‌ফারেন্স একদিনে শেষ করবার চেষ্টা করবেন না। তাহলে সময়ও পাবেন না, সকল

কথা হজম করবারও উপায় থাক্‌বে না। তা ছাড়া এক সভায় সকল শ্রোতাকে ধরবে না।

সভাপতি একই থাক্‌বেন কিন্তু পালা অন্তত দুটো হোক্‌। প্রথম দিনের পালা সাঙ্গ করে সভাপতি আগামী সভার স্থান কাল বিষয় ও বক্তার তালিকার বিজ্ঞাপন দেবেন।

হিতকর্ম্মের তালিকা ত ছোট নয় এবং তার সাধনোপায়ও দীর্ঘ—যদি চায়ের টেবিলে খবরের কাগজ পড়বার মত করে সব কথাগুলোকে লঘুভাবে তাড়াহুড়ো করে সেরে দেন, তাহলে কোনো কাজই হবে না। অতএব যাঁরা কিছু কাজের কথা বল্‌বেন, তাঁদের বলবার ভাল রকম সময় দেবেন। তিনটে সভায় যদি না বলাতে পারেন, অন্তত দুটো সভায় বলাবেন।

এই আমার পরামর্শ। যদি গ্রাহ্য না হয় অর্থাৎ যদি নানা কারণে অসাধ্য হয়, তাহলে আমাকে এবারকার মত বর্জ্জন করা ছাড়া উপায় নেই। কারণ, একদিকে আমাকে সরস্বতী তাগিদ করচেন, তার উপরে রাজলক্ষ্মীও পেয়াদা পাঠিয়েছেন—তার উপরে আবার ভারতলক্ষ্মীও যদি দরজা ঠেলাঠেলি করেন, তাহলে আমার আর আশা নেই। অতএব তিনটির মধ্যে প্রথমটিকেই মান্‌তে হচ্ছে—তাঁকে এড়ানো আমার পক্ষে সোজা নয়। তাঁর পদ্মাসনটি আমার হৃদয়ের মধ্য থেকে উঠে আমার মস্তিষ্কের মধ্যে শতদল বিস্তার করে বসেছে। অতএব রইল বারাকপুর, রইল আপনার সভা। কবির অবস্থা এখন এমনতর যে ডাক্তারের আয়ত্তের বাইরে। ইতি ১৬ই ফাল্গুন ১৩২১

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছিলেন—লর্ড হার্ডিঞ্জের পরে আমার ভক্তি আছে, তার কারণটা এই—

ভারতে অবস্থিত ইংরাজ রাজকর্মচারীদের কাছে রবীন্দ্রনাথকে পরিচিত করিয়ে দেবার জন্য এন্ড্রুজ ১৯১৩ সালের ২৬শে মে সিমলায় এক সভা করেছিলেন। সেই সভায় সভাপতি হয়েছিলেন বড়োলাট লর্ড হার্ডিঞ্জ। সভায় এন্ড্রুজ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। সভাপতি লর্ড হার্ডিঞ্জ সেই সভায় রবীন্দ্রনাথকে 'দি পোয়েট লরিয়েট অফ্ এশিয়া' বলে অভিনন্দিত করেছিলেন।

এ কথা স্মরণযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথ তখনও নোবেল প্রাইজ পান নি। তিনি নোবেল প্রাইজ পান আরও কয়েক মাস পরে নভেম্বরে।

১৯১৩ সালের ২৬শে ডিসেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের এক বিশেষ অধিবেশনে লাটভবনে রবীন্দ্রনাথকে ডি. লিট্ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলার হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে ওই উপাধি দিতে গিয়েও সেদিন রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল বলেই বড়োলাট লর্ড হার্ডিঞ্জ রাজধানী দিল্লি থেকে এবার বাংলা সফরে এসে বারাকপুরে লাটবাগানে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

এখানে একটা ব্যাপার লক্ষ করার এই যে, সেকালে কারও পক্ষেই সুস্থ শরীরে কোনো অজুহাত দেখিয়ে বড়োলাটের আহ্বানকে উপেক্ষা করা এক অকল্পনীয় কাজ ছিল। লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু সে দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন।

২. কবির 'বসন্তোৎসব' নাটক রচনা সম্বন্ধে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড গ্রন্থে লিখেছেন—'কবি এবার শান্তিনিকেতনে না থাকিয়া সুরুলের নূতন বাড়িতে গিয়া উঠিলেন। বোধ হয়, আশ্রমের নানা প্রকার উত্তেজনা তাঁহার ভালো লাগিতেছে না। ...রচনা শেষ হয় ৪ মার্চ [১৯১৫]। পরদিন আশ্রমবাসীদের নিকট পড়িয়া শুনাইলেন। উহা তখন 'বসন্তোৎসব' নামেই পঠিত হয়।' —৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৫০৩-৪

পরে কবি এই নাটকের নাম পরিবর্তন করে করেছিলেন—'ফাল্গুনী'।

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আপনাকে বিজয়ার প্রীতি সাদর জানাই ওর একটু উত্তর হবে আমার এই চিঠিখানা আপনাদের সভায় পড়ে দেবেন।

আপনাদের কুমারটুলির নরনারায়ণ ডাইরেক্টরের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছি। সে নিমন্ত্রণে আমি যেতুম কেবল, শুধু হাতছানির পানে আমার ভক্তি আছে।

কিন্তু ইতিমধ্যে আমার সম্বন্ধে একটা উৎপাত করেছেন। আমার আশ্রমের ছেলেরা সবাই ধরেছে বসন্ত উৎসবের উপযোগী একটি ছোট নাটক রচনা করে দিতে হবে। আমি কথা দিয়েছি এবং মুহূর্তের বিশ্রাম বাদ লিখতে বসে গেছি। গানের সুরগুলো মস্তিষ্কের মৌচাকটার মধ্যে গুন গুন করতে লেগে গেছে। ইতিমধ্যে হঠাৎ যদি এখান থেকে বেরতে হয় এবং তার পরে আপনাদের নিমন্ত্রণ সারতে হয় তাহলে আমার মৌচাক ছত্রভঙ্গ হবে। আমার লেখাটার পেটে চার পাঁচ দিন ডিম বেরতেই তাকে একেবারে ছাপালে খাওয়ার মত দশা করবে। তাতে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি না হতে পারে কিন্তু নিশ্চয় আমার সেটা উপাদেয় নয়।

ডাইরেক্টরকে লিখে দিলুম আমি এখানকার কাজে আছি, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে ইত্যাদি ইত্যাদি। তার দুদিন পরেই কলকাতায় পূজা দিতে গেলে আর কিছু না হোক বেজায় রকম ঠকতে হবে।

অতএব আমাকে এবারে একটিকে বাদ দিতে হবে। নাকিসুরে উদারভাবে কথাটা বুঝে দেখুন। আপনারা এই লোকেদের একদিকে শোক করবার চেষ্টা করবেন না। তাহলে মনেও পারবেন না, সকল কথা ঠিক বলবার উপায় থাকবে না। তা ছাড়া এক সভায় সকল শ্রোতাকে ধরবে না।

সভাপতি একটি থাকবেন কিন্তু পালা অন্তত দুটো হোক। প্রথম দিনের

দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির প্রথমাংশের প্রতিলিপি

ওঁ

প্রিয়বরেষু

তাহলে Wood Street-ই ঠিক হোক। সোম মঙ্গল কিম্বা বুধ এই তিনদিনের কোন একদিনে [illegible] প্রোগ্রাম হবে। সেই রকম কথা বলে পাঠাবেন।

আপনি আমার জন্যে কোনো ভয় পাবেন না। সত্য না বল্লে নয় — খুব স্পষ্ট করেই বলা চাই। ~~[illegible]~~ এবার আমার জীবনের সব [illegible] সালের উপরে [illegible] হাওয়া লাগিয়ে দিয়ে এ পারের ঘাট থেকে আমার নৌকা বিদায় দিলে। তুফানের উপর পাড়ি দেবার আমার অদৃষ্টের যদি এই মতলব হয় তবে আমার অদৃষ্টের জয় হোক — আমি নিশ্চিন্ত হব,

২৬শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২২

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির প্রতিলিপি

৩৬

১ জুন ১৯১৫

ওঁ

প্রিয়বরেষু

তাহলে Wood Streetই ঠিক থাক। সোম মঙ্গল কিম্বা বুধ এই তিনদিনের কোন একদিনে এণ্ডুজের রথযাত্রা হবে। সেই রকম কথা বলে রাখবেন।[১]

আপনি আমার জন্যে কোনো ভয় রাখ্‌বেন না। সত্য না বল্লে নয়—খুব স্পষ্ট করেই বলা চাই। এবার আমার জীবনের সব ক'টা পালের উপরে নিন্দা গালি লাঞ্ছনার ঝোড়ো হাওয়া[২] লাগিয়ে দিয়ে এ পারের ঘাট থেকে আমার নৌকো বিদায় নিয়ে তুফানের উপর পাড়ি মারবে আমার কাপ্তেনের যদি এই মৎলব হয় তবে আমার কাপ্তেনের জয় হোক্—আমি পিছু পাও হব না। ইতি ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২২

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. ১৩২২ সালে গ্রীষ্মের ছুটির সময় এণ্ড্রুজ সাহেব সেবার শান্তিনিকেতনে এসে সেই রাত্রেই কলেরায় আক্রান্ত হন। তাঁর এই কলেরা রোগ সম্বন্ধে দ্বিজেনবাবু তাঁর 'রবীন্দ্র সংসর্গে' প্রবন্ধে লিখেছেন—

'দারুণ গ্রীষ্ম। শান্তিনিকেতনে তখন ছুটি। সকলে চলে গেছেন। কবি আছেন একলা, আর আছেন মিঃ এণ্ড্রুজ কলেরায় আক্রান্ত। বোলপুর যেতে রেলপথে পিপাসা নিবৃত্তি করতে গিয়ে, কাটা তরমুজ খাওয়াতেই নাকি কলেরার বীজ প্রবেশ করে।

তখনো আমি মেয়ো হাসপাতালের রেসিডেন্ট সার্জন। কবি আমাকে তার করলেন—এণ্ড্রুজ সাহেবের চিকিৎসার জন্যে। ...কবি নিজেই তাঁর

হোমিওপ্যাথিক বিদ্যাব চিকিৎসা আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। শিউড়ির সিভিল সার্জন একবার এসেছিলেন মাত্র। যাই হোক্, গিয়ে দেখি রোগের বাঁক ফিরেছে, ভয় প্রায় কেটেছে। আমাকে বিশেষ আর কিছু করতে হল না।'

এরপর এন্ড্রুজ কলকাতায় উড স্ট্রিটের এক নার্সিং হোমে এসে ভর্তি হন। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশেই দ্বিজেনবাবু এই নার্সিং হোম ঠিক করেন।

এন্ড্রুজ নার্সিং হোমে থাকাকালে রবীন্দ্রনাথ সেখানেও মাঝে মাঝে তাঁকে দেখতে যেতেন। এ সম্বন্ধে এন্ড্রুজ নিজেই লিখে গেছেন—'উড স্ট্রীটের খালি ঘরখানিতে যে আপনি আমায় দেখতে আসতেন... সে-সব দিনের স্মৃতিও অমূল্য সম্পদের মতো আমার মনের গভীরে সঞ্চিত আছে।' — রবীন্দ্রনাথ-এন্ড্রুজ পত্রাবলী।

২. বঙ্গবাসী, নায়ক, বসুমতী ও সাহিত্য পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ ক'রে লেখা প্রকাশিত তো হোতই, তার উপর ১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে চিত্তরঞ্জন দাশ (তখনও দেশবন্ধু হননি) 'নারায়ণ' পত্রিকা বার করলে তাতেও রবীন্দ্র-আক্রমণ শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথের উপর চিত্তরঞ্জনের তখনকার এই বিরূপ মনোভাবের কারণ খুঁজতে গিয়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী' ২য় খণ্ড গ্রন্থে লিখেছেন—'চিত্তরঞ্জন বাংলাসাহিত্যে আপনার স্থান করিবার জন্য আগ্রহান্বিত। গত জ্যৈষ্ঠ (১৩২১) মাসে তিনি 'সাগরসংগীত' নামে এক কাব্যখণ্ড প্রকাশ করেন। বহু সহস্র অর্থ ব্যয়ে উহা মুদ্রিত হয়, বাংলা ভাষায় এমন রূপ-বাহুল্যে কোনো গ্রন্থ বোধহয় ইতিপূর্বে মুদ্রিত হয় নাই। শুধু তাহাই নহে, অরবিন্দ ঘোষের দ্বারা তাহার সুললিত অনুবাদ করাইলেন। 'সাগরসংগীত' প্রকাশিত হইলে রবীন্দ্রনাথ ওই কাব্য সম্বন্ধে কোনো মতামত প্রকাশ করেন নাই। যে গ্রন্থ তাঁহার ভাল লাগিত না, সে সম্বন্ধে তিনি মৌনী থাকিতেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জনের বিরূপতার উহা অন্যতম কারণ কি না জানি না।'

রবীন্দ্রনাথ ১৩২১ সালের শ্রাবণ সংখ্যা সবুজপত্রে 'স্ত্রীর পত্র' নামে একটা গল্প লিখেছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল সেই গল্পের জন্য রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করে নারায়ণের প্রথম সংখ্যাতেই 'মৃণালের কথা' লেখেন। সেই রচনার প্রথমটা এইরূপ—

'ভগিনীর পত্র

মেজদাদা,

তোমার চিঠি পাইলাম। মৃণালের পত্রখানাও পড়িলাম। লেখার ঢংটা দেখেও কি বুঝনি ও চিঠি তার নিজের নয়। তুমি রাগ কোরো না, তার বিদ্যে কত আমরা তো জানি। দেখছো নাকি, যে-সব গ্রন্থের কথা গেঁথে গেঁথে মেজ বউ এই চিঠিটা সাজিয়েছে। আমার সন্দেহ হয়, এ চিঠিটা সত্যি সত্যি মেজ বউর লেখা কিনা। তার যে ভাইটার কথা লিখেছে, তাকে তো তুমি বেশ জান। শুনছি সে নাকি একজন ভারি লিখিয়ে হয়ে উঠছে। শুঁড়ওয়ালা নাগরা জুতা পায় দেয়, চুড়িদার জামা পরে আর কবিদের মতন বাবরি চুল রেখেছে। শুনছি রবি ঠাকুরের সঙ্গেও নাকি খুবই জানাশুনা আছে। সেই হয়তো এই চিঠিটা লিখে দিয়েছে। লেখার খুব বাহাদুরি আছে। উনি পড়ে বল্লেন যে ঠিক যেন রবি ঠাকুরেরই মতন। তুমি কি জান? মেজ বউই আমায় লিখেছিল যে 'সঞ্জীবনী'তে স্নেহলতা ছুঁড়িটার যে চিঠি বেরিয়েছিল, সেটা নাকি এই ছোঁড়াটারই লেখা। স্নেহলতার নাম জাল করে ছাপিয়েছেন। আমাদেরও পড়েই তাই মনে হয়েছিল। হিন্দুঘরের মেয়ে যতই জ্যাঠা হোক না কেন, অমন চিঠি লিখতে পারে না।'

রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের নায়িকার নাম মৃণাল এবং সে বাড়ির মেজ বউও। বিপিনচন্দ্র তাঁর রচনার নাম 'মৃণালের কথা' দিয়ে, তাতে মৃণালের চিঠির কথা নিয়েই লিখেছেন এবং তিনি তাঁর রচনায় মৃণালকে মেজ বউ হিসাবেও দেখিয়েছেন।

বিপিনচন্দ্র তাঁর 'মৃণালের কথা'য় যে স্নেহলতার উল্লেখ করেছেন, সে সময় স্নেহলতার আত্মহত্যা নিয়ে দেশে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। বিপিনচন্দ্র স্নেহলতাকে অশিক্ষিতা বা অল্পশিক্ষিতা বলে লিখলেও, সুদূর ব্রহ্মদেশে বসে শরৎচন্দ্র কিন্তু স্নেহলতাকে শিক্ষিতা মনে করেই তখন তাঁর এক প্রবন্ধে লেখেন—'সেদিন স্নেহলতার আত্মবিসর্জনের কাহিনী সংবাদপত্রে পড়িয়াই মনে হইয়াছিল, ঠিক এমনি করুণ, এমনি স্বার্থত্যাগের চিত্র কিছুদিন পূর্বে গল্প সাহিত্যে পড়িয়াছিলাম। সে মেয়েটিও দরিদ্র পিতাকে দুঃখ কষ্ট হইতে অব্যাহতি দিবার জন্যই আত্মবিসর্জন করিয়াছিল। তাহারও বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইতেছিল

এবং পাত্র পাওয়া যাইতেছিল না।' —মাতৃভাষা ও সাহিত্য—যমুনা, আষাঢ় ১৩২১।

বিপিনচন্দ্র পালের ন্যায় রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ও তখন বিভিন্ন পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে লিখেছিলেন। ১২২২ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'সাহিত্য'য় রাধাকমলের 'সাহিত্য ও স্বদেশ' প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে, পরের মাসে 'সবুজ পত্রে' রবীন্দ্রনাথ 'কবির কৈফিয়ৎ' নামে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এর আগে ১৩২১ সালের শ্রাবণ সংখ্যা সবুজপত্রে রবীন্দ্রনাথের 'বাস্তব' প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে, ওই সবুজ পত্রেই পরের মাঘ মাসে রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 'সাহিত্যে বাস্তবতা' নামে প্রবন্ধ লিখে রবীন্দ্রনাথের লেখার প্রতিবাদ করেছিলেন। সবুজপত্র সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী ওই মাঘ সংখ্যাতেই 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি' নামে তাঁর এক রচনায় রাধাকমলবাবুর লেখার উত্তর দিয়েছিলেন।

৩৭

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬ — শিলাইদা

ওঁ

প্রিয়বরেষু

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা বিপদের কারণ। আমি বৃদ্ধ। আপনাদের সভা তরুণী, এ সভার পতিত্ব পদ গ্রহণের কাল আমার উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এখনো তাজা আছে এমন কোনো লোককে পাকড়াও করবেন।

তা ছাড়া, আমি সংসারে কেবল একজন কবি মাত্র, নিজের এই চৌহদ্দিটুকু সম্পূর্ণ মেনে নিয়ে তারই মধ্যে শেষ কয়টা দিন কাটাতে চাই। আমার দ্বারা দেশের কাজ আদায়ের আশা একেবারে ছেড়ে দেবেন। আমি দূরে থাকলে দেশও আরামে থাক্‌বে, আমিও।

আমাকে স্থায়ী সভাপতি করতে চান। কিন্তু স্থায়িত্বের শেষ কিনারায় এসে দাঁড়িয়েচি। যে জমি পদ্মার ভাঙনের মুখে তাকে

মৌরসী করে নিয়ে লাভ কি? আপনাদের সভার আশু বৈধব্য বাঁচিয়ে চলবেন।

বিচিত্রাকে[১] খুব বেশি Seriously নেবেন না। ওটাকে কোনো রাজকীয় চতুর্দ্দোলার মত দশের ঘাড়ে চাপাব না। নিজেরা কোণে বসে যদি ওটাকে গড়ে তুলতে পারি ভালই, না পারি ত পড়ে থাক্‌বে, বিসর্জ্জনেরও খরচ লাগবে না। যখন বোলপুর বিদ্যালয় সৃষ্টি করেছিলুম একলাই করেছিলুম, এখনো প্রায় একলাই চালাচ্চি। বিচিত্রার জন্মোৎসবে বাহির থেকে দু চার জনকে নিমন্ত্রণ করেছিলুম, দেখা গেল সেটা তাঁদের প্রতিও জুলুম, বিচিত্রার প্রতিও বিশেষ আনুকূল্য নয়। আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল নাম নেবার যোগ্যতা লাভ করি নি, কিন্তু আমরা খাপছাড়ার দল। অতএব খাপের বাইরে যদি নিজের চেষ্টায় আশ্রয় জোটাতে পারি ত তবেই টিক্‌লুম, না পারি ত অন্তত আর কারো কোনো ক্ষতি করব না। 'এক্‌লা চল, এক্‌লা চল, এক্‌লা চলরে।'

এই শিলাইদহের ছাদের উপরকার ঘরে বসে এই একটি সঙ্কল্প মনের মধ্যে পাকা করে নিতে চেষ্টা করচি—সেটি হচ্চে এই, যিনি অযাচিত দিয়ে এসেচেন, তাঁরই পায়ের তলায় জোড়হাতে বসে থাক্‌ব—অঞ্জলির উপরে প্রসাদ যা এসে পড়বে সেইটিকেই সংসারের মধ্যে সত্য দান বলে মাথায় করে নেব—কারো উপর দাবী করব না। কারণ তা করতে গেলেই দানের মূল্যকে দাবীর পরিমাণের সঙ্গে তুলনা করে দানের প্রতি অশ্রদ্ধা আসে—সেইটেই অপরাধ, সুতরাং সেইখানেই দুঃখ।

ওরে ভীরু, তোমার পরে নাই ভুবনের ভার
হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার।

আজ রাত্রের গাড়িতে পিয়ার্সন[২] আস্‌বেন। তাঁকে নিয়ে বোটে করে ভেসে পড়ব। যদি পারি তাঁকে আমাদের পতিসরটা[৩] দেখিয়ে আনব।

রথী[৪] আজ কলকাতায় ফিরে গেলেন। গগনকে লিখেছি, আপনাদের হাতেই ফাল্গুনীর সম্পূর্ণ টাকা দিয়ে দিতে। কোনো বাধা হবে বলে আশঙ্কা করি নে। রথীর সঙ্গে দেখা করে ঠিক করে নেবেন। যদি ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে ভিন্ন ভিন্ন দলের হাতে দিলেই উপকার হয় তবে সে আপনারাই দেবেন। নিরন্নের পেটে অন্ন পৌঁছলেই টাকাটা ঠিক জায়গায় পৌঁছবে—কোন্ নামধারী সম্প্রদায়ের হাত দিয়ে পৌচচ্চে সেটা কিছুই নয়। ইতি ৮ই ফাল্গুন ১৩২২

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. বিচিত্রা—জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথদের বাড়িতে স্থাপিত শিল্পী-সাহিত্যিকদের মিলন কেন্দ্র।

২. পিয়ার্সন—উইলিয়ম উইনস্টন পিয়ার্সন ইংলন্ডের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে কলকাতায় এসে ভবানীপুরে লন্ডন মিশন সোসাইটি কলেজে অধ্যাপনা করতেন। ভাল বাংলা শিখেছিলেন। পরে তিনি শান্তিনিকেতন আশ্রমের কাজে যোগদান করেছিলেন।

৩. পতিসরটা—নদীয়া জেলার শিলাইদহের মতো রাজসাহী জেলার পতিসরেও ছিল রবীন্দ্রনাথদের জমিদারি।

৪. রথী—রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩৮
২৪ মার্চ ১৯১৬

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আপনার রিপোর্টে আমার নাম আর যে-কোনো আকারে ও উপলক্ষ্যে ব্যবহার করুন পল্লির কাজটাকে বাদ দিবেন। আমার কাজকে আমি কোনোমতেই প্রচার করিতে চাই না—কারণ আমি পাব্লিকের কাছে সাহায্য চাইনা, খ্যাতিও চাই না, সুতরাং নিন্দাও না।

আমার কাজ আমার গোপন কাজ—এ কাজ যাঁহাকে উৎসর্গ করিয়াছি তিনিই তাহার রিপোর্ট গ্রহণ করিবেন। এই পল্লির কথা আপনি রিপোর্টে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

মিস দত্তও এখন পল্লির কাজে নাই। তিনি ত অগত্যা বিদ্যালয়ে পড়াইতেছেন সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে রিপোর্টের উক্তিটি খাপ খাইতেছে না।

আর কিছু বলিবার নাই। মোট কথাটা, যে কাজ আমার জীবনের সাধনা তাহাকে বাহিরের দৃষ্টির সম্মুখে স্থাপিত করিয়া ধরা আমার সাধনার প্রতিকূল—তাহাতে কাজেরও ক্ষতি হয়—নিজেরও। এইজন্যেই, আপনি বিরক্ত হইবেন জানিয়াও এই বিষয়ে আপনাকে সম্মতি দিতে পারিলাম না—কারণ বিষয়টি আমার পক্ষে বিশেষ গুরুতর। ইতি ১১ই চৈত্র ১৩২২

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই চিঠিটি লেখার তারিখ ১৩২২ সালের ১১ই চৈত্র অর্থাৎ ১৯১৬-র ২৪শে মার্চ। রবীন্দ্রনাথ এই চিঠিতে পল্লীর কাজটাকে বাদ দিতে বললেও

তিনি এর এক বছর আগেই ১৯১৫র ২৮শে মার্চ হিতসাধনমণ্ডলীর সভায় 'পল্লীর উন্নতি' নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে যাই বলুন, তিনি হিতসাধনমণ্ডলীর সহ-সভাপতি হয়েছিলেন এবং পরে ১৯২৪—৩০ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতিও ছিলেন।

বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর উদ্‌বোধন সভা হয় ১৩২১ সালের ১লা ফাল্গুন। সেই সভায় সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। বক্তা হিসাবে রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন। সেদিন রবীন্দ্রনাথ যে মৌখিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার সারমর্ম 'কর্মযজ্ঞ' নামে ১৩২১ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'সবুজ পত্র' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

হিতসাধন মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানের পর ওই ফাল্গুন মাসেরই শেষ দিকে হিতসাধনমণ্ডলীর আর এক সভা আহ্বান করেন এবং তাতে রবীন্দ্রনাথকে উপস্থিত থাকবার জন্য অনুরোধ জানান। রবীন্দ্রনাথ ওই দিনের সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে জানালে দ্বিজেনবাবু সভার তারিখ বদলে চৈত্রের মাঝামাঝি, ২৮শে মার্চ করেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ওই দিনের সভায় এসেছিলেন এবং এসে যে মৌখিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেটা ১৩২২ সালের বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসী পত্রিকায় 'পল্লীর উন্নতি' নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

৩৯

[১৯.৩.১৭]

ওঁ

প্রিয়বরেষু

বুঝতেই পারচেন কিং রকম ব্যাপার চল্‌চে। আলাপ আলোচনা আন্দোলনের আদি অন্ত নেই। এই প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেলে চুপ্‌চাপ করে বসে জগৎটাই বা কি জীবনটাই বা কেন ইত্যাদি

তত্ত্ব কথা চিন্তা করবার অবকাশ পাওয়া যাবে।

আপনি তাহলে আমার দরবারটা ভোলেন নি। আমি কালই বেন্ট্‌লি সাহেবকে[১] নিমন্ত্রণ করে পাঠাব। আপনারও সঙ্গে আসা চাই।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছি। দেখা হলে মোকাবিলায় কথাবার্ত্তা হবে। ইতি সোমবার

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. বেন্টলি সাহেব ছিলেন সেকালের বাংলা সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের অধিকর্তা। তিনি ম্যালেরিয়া ও ম্যালেরিয়ার মশক নিবারণে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন।

৪০
[২১.৩.১৭] শান্তিনিকেতন

ওঁ

প্রিয়বরেষু

শান্তিনিকেতনের বাড়িতে গিয়ে দেখি সেখানে অতিথিদের আশ্রয় দেবার মত আসবাবগুলি অধিকাংশই অন্তর্ধান করেছে। সেইজন্যে বেন্ট্‌লি সাহেবকে এখন হঠাৎ ডাকতে পারলুম না। শীঘ্র কিছু আসবাব সংগ্রহের চেষ্টায় রইলেম। আগামী কবে নাগাদ তাঁকে আনবার সুবিধা হবে আমাকে জানাবেন। ইতিমধ্যে আপনি যদি week endএ এক আধদিনের জন্যেও আসতে পারেন তাহলে সরেজমিনে ও মোকাবিলায় অনেক কথার আলোচনা হতে পারবে।

ক্ষুধিত চকোরের মত অপেক্ষা করে রইলুম—আর একটু হলেই "চাতকের মত" লিখ্‌তে যাচ্ছিলুম, কিন্তু আপনার মুখশ্রী স্মরণ করে সংশোধন করে নিলুম। ইতি তারিখ জানিনে।

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪১

২৪ ডিসেম্বর ১৯১৭

ওঁ

প্রিয়বরেষু

'তোমার হল সুরু
আমার হল সারা।'

আপনি উদয়াচলে, আমি অস্তাচলে। আপনি কাজের মুখে আমি বিশ্রামের মুখে। তাই মিলনে কঠিন।

এখানে Dr. Harish Chandra নামক পশ্চিমের যুবক এসেছিলেন। Berlin University তে পড়ে ডিগ্রী নিয়ে ডেরাডুনে Laboratory খুলে খুব কসে কাজ করচেন। একটা Infant's artificial food বানিয়েচেন, সেটা যদি ভাল বোধ করেন ত বটকৃষ্ণকে বলে দিয়ে একটা সদ্গতি করে দেবেন। ইনি Starch থেকে চিনি করবার একটা method আবিষ্কার করেচেন, একজন খুব বড় ধনী তারই কারবার খুলতে প্রবৃত্ত। সুতরাং এর ভবিষ্যৎটা সোনার দীপ্তিতে উজ্জ্বল। দেখতে শুনতে লোকটি ভালই। শিক্ষিত মেয়ে বিয়ে করতে চান। আপনাদের হিতসাধনমণ্ডলী ঘটকালি করেন কিনা জানিনে। কিন্তু কাজটা হিতবুদ্ধি থেকে করা যেতেও পারে—অন্তত কন্যার বাপের। তারপরে ভিন্ন প্রদেশের মিলন

সাধনও দেশহিতৈষীদের কাজ। অতএব একটু চিন্তা করে দেখবেন। আমার ঘরে একটি নাৎনী আছে, কিন্তু আমি শিশু বিবাহের বিরোধী তাই সেদিকে চেষ্টা করলুম না। আপনার পরিচিতাদের মধ্যে একবার চোখ বুলিয়ে দেখবেন। ক্লান্ত আছি বলে কলকাতায় গেলুম না। ইতি ৯ই পৌষ ১৩২৪

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪২
১ অক্টোবর ১৯১৮

ওঁ

বন্ধুবরেষু

আমি নির্ব্বাসনের আনন্দে আছি—ইস্কুল মাস্টারি করচি, যদি কখনো এ অঞ্চলে আসেন ত দেখা পাবেন।

অন্নদা মজুমদার আমার এখানকার ছাত্র। তার lungs পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়েচে। দয়া করে একবার পরীক্ষা করে তার অভিভাবককে যথোচিত পরামর্শ দিবেন। ইতি ১৪ই আশ্বিন ১৩২৫

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৩
১৪ নভেম্বর ১৯১৮

ওঁ

প্রিয়বন্ধুবরেষু

সেই শান্তিনিকেতন প্যারাগ্রাফগুলি দীর্ঘকাল আপনার কাছে আছে। সেই কাপিটিতে আমার প্রয়োজন ঘটেচে। অতএব এক

কাজ করবেন—রথী কলকাতায় আছে, তার কাছে দেবেন। সে আসবার সময় নিয়ে আসবে অথবা যদি রেজেস্ট্রি ডাকে সোজা এইখানে পাঠিয়ে দেন তাহলে ভালই হয়।

আপনি বোধ হয় পূর্ব্ববৎ ব্যস্ত আছেন। আমিও যে নিতান্ত কুঁড়েমি করে দিন কাটাচ্চি তা নয়—যদিও বিদ্যালয় বন্ধ আছে তবু কাজ চল্‌চে। ইতি ২৮শে কার্তিক ১৩২৫

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৪
২৯ ডিসেম্বর ১৯১৮

ওঁ

প্রিয়বরেষু

অজিতের[১] অবস্থার কথা শুনে মন বড় উদ্বিগ্ন হল। বুঝতে পারচি কোনও আশা নেই এবং এতক্ষণে হয়ত জীবন অবসান হয়ে গেছে। অল্প বয়স থেকে ও আমার খুব কাছে এসেছিল—ও যদি চলে যায় ত একটা ফাঁক রেখে যাবে। আমার ঘরেও বিপদ খুব নিকটে এসেছিল। বৌমা[২] ন্যুমোনিয়ায় পড়েছিলেন—এক রাত্রি একদিন শ্বাসকষ্ট এমন হয়েছিল যে, ভেবেছিলুম রক্ষা বুঝি পাবেন না। আমার এখানে ডাক্তারের মধ্যে আমি এবং ক্ষিতিমোহনবাবু। Phosph দিয়ে ব্যামোটাকে ঠেকানো গেল—এদিকে সুহৃদ[৩] এসে পড়ল। কিন্তু তার ওষুধ ব্যবহার করতে হয়নি—কাল খুব একটা পেটের অসুখের উপসর্গ এর সঙ্গে দেখা দিয়েছিল, সেটা

Podophylhm সেরে গেছে। এখনো শ্বাসের ক্লেশ আছে, কিন্তু মন্দ লক্ষণ সব গেছে—জ্বরের তাপও যথেষ্ট কমেচে। সুহৃদ এখনো আছে, কলকাতা থেকে একজন Nurse আনাতে হয়েছে। এখানকার অন্য মেয়েরাও সকলেই প্রায় শয্যাগত হেমলতা বৌমা[৪], সুকেশী বৌমা[৫], Miss Terring[৬]। ইনফ্লুয়েঞ্জা কিন্তু সে তার ব্রহ্মাস্ত্র মারেনি। ছাত্ররা সৌভাগ্যক্রমে সকলেই ভাল আছে—তাদের সকলকেই রোজ পঞ্চতিক্ত পাঁচন খাওয়াই—আমার বিশ্বাস সেই জন্য তাদের মধ্যে একটি Case-ও হয়নি, অথচ তারা অধিকাংশই সংক্রামকের কেন্দ্র থেকে এবং রোগগ্রস্ত পরিবার থেকে এসেচে। যা হোক্ অজিতের ফাঁড়াটা যদি কেটে যায় তাহলে বড় আনন্দিত হব। আপনার বাড়ির সব ভাল খবর পেয়ে নিশ্চিন্ত হলুম। ইতি ১৪ই পৌষ ১৩২৫

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. অজিতকুমার চক্রবর্তী ১৯০৪ থেকে ১৯১৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে দিন এই চিঠি লেখেন, সেই দিনই (১৪ই পৌষ ১৩২৫) মাত্র ৩২ বছর বয়সে কলকাতায় মহামারী ইনফ্লুয়েঞ্জায় অজিতকুমারের মৃত্যু হয়।

২. বৌমা—প্রতিমা ঠাকুর।

৩. সুহৃদ—আশুতোষ চৌধুরীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাক্তার সুহৃদ চৌধুরী।

৪. হেমলতা বৌমা—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের পত্নী।

৫. সুকেশী বৌমা—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র কৃতীন্দ্রনাথের পত্নী। সেই সময় ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে ইনি মারা যান।

৬. Miss Terring—শান্তিনিকেতনে আগতা বিদেশিনী।

৪৫

ওঁ

প্রিয়বরেষু

কলকাতায় এসেছি। একবার অবিলম্বে দেখা হওয়া নিতান্ত দরকার। রথী আমার রথসমেত রাঁচি গেছে, নইলে নিজেই যেতুম। আগামীকাল শুক্রবারে সায়াহ্নে দুইজন পাঞ্জাবি গাইয়ে গান গাইতে আসবে। যদি আসেন গানও শুনবেন, গল্পও হবে, তর্কও হতে পারবে এবং একটা মীমাংসা হওয়াও হয়ত অসম্ভব হবে না। ইতি বৃহস্পতিবার

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৬

ওঁ

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

আজ ভাবিয়া ছিলাম একবার দেখা করিয়া আসিব কিন্তু আজ এক সভা আছে সেখানে বক্তৃতা করিতে হইবে—হয়ত কিছু ঝগড়াঝাঁটিও চলিবে—তাই শক্তিটাকে জমাইয়া রাখিতে চাই। অথচ আপনার সঙ্গে দেখা না করিলে নয়। একবার রাত্রি ৮টার পর ১০টার মধ্যে দেখা হওয়া কি অসম্ভব হইবে? ইতি শনিবার

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৭

[১৪ ? অগস্ট, ১৯১৭]

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আজ সকালে অর্থাৎ এখনি আপনার সঙ্গে টেলিফোনে কথাকৈবার ব্যর্থ চেষ্টা করে শেষকালে চিঠির আশ্রয় নিচ্চি।

ক'দিন থেকে ভিতরে ভিতরে বোধ করছিলুম শরীরটা ভেঙে পড়ল বলে। কোনো কাজ করতে ইচ্ছা করছিল না। আর ক্লান্তিতে যেন মাটির দিকে টানছিল। আজ সকালবেলা সেই ক্লান্তির সঙ্গে মাথাঘোরা দেখা দিয়েছিল। খানিকক্ষণ পরে সেটা সেরে গেছে কিন্তু মস্তিষ্কের ভিতরে কেমন যেন কুয়াশার মত এখনো ঘোর-ঘোর করে আছে। বুঝেচি না-পালালে আমার নিষ্কৃতি নেই। কালই আমি বোলপুরে যাচ্ছি। অতএব আজ সকালে বেলার ওখানে এবং বালিগঞ্জে আমার কাজ সেরে নিতে। ফিরে এসে দুপুরবেলা একটু বিছানায় পড়ে বিশ্রামের চেষ্টা দেখব, যদি সম্ভব হয়—তারপরে কখন্ C.M.S[১]এ যেতে হবে বলবেন। আপনি কি নিয়ে যাবেন? ওদের কলেজ কোথায় জানিনে। অর্থাৎ একবার গিয়েছিলুম কিন্তু দিক্ ভুলে গেছি। বেশিক্ষণ কথাবার্ত্তা কইতে পারব না। ১৫।২০ মিনিট থেকে চলে আসতে হবে। মনে হচ্চে অতলস্পর্শ ক্লান্তির মধ্যে ডুবেচি।

আপনাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. C.M.S.—তখনকার Calcutta Medical School. দ্বিজেনবাবু নিজে ডাক্তার ছিলেন, তাই ওই Calcutta Medical Schoolএর সঙ্গে তাঁর কোনো না কোনোরূপ যোগাযোগ ছিল।

তখন মেডিকেল কলেজ ও কারমাইকেল কলেজ নামে দুটি কলেজ এবং ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল, ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুল ও ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল নামে তিনটি স্কুল ছিল। ছাত্র-ছাত্রীরা মেডিকেল কলেজ ও কারমাইকেল কলেজ থেকে পাস করে এম. বি. বা ব্যাচেলার অফ্ মেডিসিন ডিগ্রি পেতেন। পড়তে হ'ত ৫ বছর। আর ১ বছর থাকতে হ'ত শিক্ষানবিস। বাকি তিনটি মেডিকেল স্কুলে ৪ বছর পড়ে ছাত্র-ছাত্রীরা ডিগ্রি পেতেন এল. এম. এফ. বা লাইসেনসিয়েট অফ মেডিকেল ফ্যাকালটি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিতে লিখেছিলেন—ওদের কলেজ—আসলে এই মেডিকেল স্কুলগুলিও কলেজই। অন্তত ম্যাট্রিক পাস করে তবেই এই সব স্কুলে ভর্তি হতে হ'ত। এম. বি. পড়ার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের অন্তত আই. এস-সি. পাস করতে হ'ত।

এখন কারমাইকেল কলেজের নাম হয়েছে কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রাধাগোবিন্দ করের নামে আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ, ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল হয়েছে বর্তমানে বিখ্যাত চিকিৎসক নীলরতন সরকারের নামে—নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ।

ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুল হয়েছে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ। ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল এই ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের সঙ্গে মিশে গেছে। শিয়ালদহ রেল স্টেশনের কিছুটা উত্তরে অবস্থিত ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুলের বাড়িতে বর্তমানে হয়েছে E.S.I. Hospital.

৪৮

১৪ জুন ১৯২২

ওঁ

প্রীতিনমস্কার সম্ভাষণ—

যদিও ইংরেজিতে লেখা তবুও আপনার চিঠিখানি পড়ে ভারি খুসি হলুম। শুধু যে আপনি উপবাসী রাশিয়ান বিদ্বজ্জনের[১] জন্যে দান করেচেন বলে আমার আনন্দ তা নয়, আমার উপরে যে দায় অর্পণ করা হয়েচে, সেই দায় সার্থক করবার কথাও নিশ্চয়

আপনার মনে ছিল। তাই মনে করে আমার আহ্লাদ হল। য়ুরোপ থেকে উপবাসের কান্না ভারতবর্ষের দ্বারে এসে পৌঁচেছে—এও ত বিধির বিপাকে সম্ভবপর হল—এখন কেবল আশা করচি আমাদের তরফে যেন কোন কার্পণ্য না হয়। কিছু কিছু করে টাকা এসে পৌঁচচ্ছে।

ঘোর বর্ষা নেমেছে—দুটো একটা করে গান জমে উঠচে। ইতি ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. বিশ্বভারতীর প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী বিংশ খণ্ডে 'রাশিয়ার চিঠি' আছে। এই খণ্ডের গ্রন্থপরিচয় অংশে রাশিয়ার চিঠি প্রসঙ্গে এক স্থানে বলা হয়েছে—

'১৯২২ সালে রাশিয়ার দুর্ভিক্ষে বিপন্ন রুশীয় মনস্বীদের সাহায্যের জন্য সর্বত্র যে আবেদন প্রচারিত হয়, তদনুরূপ আবেদন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পি. ভিনোগ্রাডফ এ দেশে রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রেরণ করেন এবং ওই পত্রের প্রারম্ভে লেখেন—

Oxford, May 19, 1922

When I met you in Calcutta eight years ago, I little thought that I should have to appeal to you on behalf of my unfortunate countrymen in Russia.

The impression I carried away after our interview was that I had met one who was fitted to represent the great Indian nation that has struggled for centuries with all kinds of hardships physical and moral. It is to such humanitarians and idealists that I appeal in order to bring to their notice a particularly grievous and pressing need—the need of the intellectual leaders, the brain-workers of Russia who are threatened with destruction...

ওই গ্রন্থ-পরিচয় অংশে এ সম্পর্কে, তখনকার 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটিও দেওয়া হয়েছে। প্রবাসীর সেই সংবাদটি এই—রবীন্দ্রনাথ বিনীতভাবে এই কার্যে নিজের অযোগ্যতা জানাইয়া তাহা সত্ত্বেও দৈনিক কাগজগুলিতে অধ্যাপক ভিনোগ্রাডফের চিঠির সারাংশসমেত নিজের আবেদন ছাপাইয়াছেন। তাঁহার নিকট শান্তিনিকেতন ডাকঘরের ঠিকানায় যিনি অর্থ পাঠাইবেন, তিনি তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া যথাস্থানে পাঠাইয়া দিবেন।

এ সম্পর্কে ১৯২২ খৃস্টাব্দের ৭ই ও ২৭শে জুন তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, সেই সংবাদ দুটিও পর পর এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম—

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভিনোগ্রাডফ রবীন্দ্রনাথের নিকট একখানা পত্রে জানাইয়াছেন যে, রুশের বহু মনীষী অন্নাভাবে মারা যাইতেছেন। তাঁহাদের রক্ষা জগতের পক্ষে মঙ্গলজনক। এইজন্য রবীন্দ্রনাথকে সাহায্যার্থে একটি কমিটি গঠন করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। কেহ কিছু দান করিতে ইচ্ছা করিলে উহা বোলপুর রবীন্দ্রনাথের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিতে পারিবেন।

'রুশ মনীষী-সাহায্য ভাণ্ডার'—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রুশ দেশীয় মনীষিগণের জন্য যে সাহায্য ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে এই পর্যন্ত আড়াই হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ তখন টাকা তুলে রাশিয়ায় শুধু পাঠানোই নয়, শান্তিনিকেতনের আর্থিক দুরবস্থা সত্ত্বেও শান্তিনিকেতনে আগত এক রুশ অধ্যাপকের এখানে চাকরিরও ব্যবস্থা করেছিলেন। এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী প্রফুল্লকুমার সরকার তাঁর 'গুরুদেবের শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে লিখেছেন—'রুশ অধ্যাপক বোরীশ স্বদেশে খোয়া ভেঙে পেট চালাতে হ'ত বলে ভারতে চলে এসে শান্তিনিকেতনে আশ্রয় নেন। তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। গুরুদেব তাঁর কাজের জন্য এক শত টাকা বরাদ্দ করেন।' পৃঃ — ৯৫

রবীন্দ্রনাথের স্থাপিত 'রুশ মনীষী-সাহায্য ভাণ্ডারে' ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র যেমন অর্থ সাহায্য করেছিলেন, তেমনি অমল হোমও সাহায্য করেছিলেন। ওই অর্থ সাহায্য পেয়ে রবীন্দ্রনাথ তখন অমলবাবুকে যে চিঠি লিখেছিলেন, সেই চিঠিতে উল্লেখ করা টাকার অঙ্কটা বাদ দিয়ে ১৩৬৪ সালের কার্তিক-পৌষ

সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকায় অমলবাবু চিঠিটা ছাপিয়েছেন। চিঠি এই—

জুন ৮, ১৯২২

কল্যাণীয়েষু

রুশিয়ার উপবাসী বিদ্বজ্জনের সাহায্যার্থে তোমার দান... পেয়ে খুব খুসি হলুম। কমিটি বাঁধবার জন্যে শীঘ্রই কলকাতায় যাব—ইতিমধ্যে তুমি প্রমথ বাঁড়ুয্যে মশায়ের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে রেখো। তিনি যদি প্রস্তুত থাকেন, তাহলে তাঁকেই সেক্রেটারির পদে বরণ করা যাবে। ভিনোগ্রাডফের পত্রের অধিকাংশ (আমার সম্বন্ধীয় প্রশংসাবাণী বাদে) খবরের কাগজে পাঠানো যাচ্ছে।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভিনোগ্রাডফ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। মনে হয়, ভিনোগ্রাডফ যখন কলকাতায় এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, সেই সময় তিনি এক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক বলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল'কলেজের অধ্যাপক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও দেখা করেছিলেন। ভিনোগ্রাডফের সঙ্গে প্রমথবাবুর এই পরিচয়ের জন্যই হয়ত রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে তাঁর রুশ মনীষী-সাহায্য ভাণ্ডারে প্রমথবাবুকে সম্পাদক করার কথা লিখেছিলেন।

৪৯

আলিপুর

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আপনার চিঠি বোলপুরে আটকা পড়ে অবশেষে এখানে যখন আমার হাতে এসে পড়ল, তখন আপনার কাজ সম্পন্ন হয়ে চুকে গেছে। তাই আপনার অনুরোধ রাখতে পারলুম না।

এখানে সিংহের পিঞ্জরের পাশেই আমার কেদারার মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে দুর্ব্বল শরীরের লালন করচি—আর সমস্ত কাজ বন্ধ। একে

বলে বাঁচবার লোভে মরে' থাকা। অথচ আমার বাঁচবারও লোভ নেই, মরবারও ভয় নেই। ইতি তারিখ জানিনে।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হাতে বিলি চিঠি, চিঠি পাওয়ার তারিখ চিঠিতে লেখা আছে ১৯.৩.২৫

রবীন্দ্রনাথ এই সময় আলিপুর চিড়িয়াখানার পাশে আবহাওয়া অফিসে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বাসায় ছিলেন। প্রশান্তবাবু তখন আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত অফিসার।

৫০

Santiniketan
18.3.27

ওঁ

Spring Festival to-morrow Saturday evening earnestly requested your presence.

Rabindranath Tagore

এই লেখাটি একটি টেলিগ্রাম। দেখা যাচ্ছে, শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসবে উপস্থিত থাকার জন্য রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেনবাবুকে ওই টেলিগ্রাফ করেছিলেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ডে (২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৭৪) লিখেছেন—

দোল পূর্ণিমার পরদিন (১৩৩৩ চৈত্র ৪। মার্চ ১৮) শান্তিনিকেতনে 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা'[১] অভিনীত হয়। জনৈকা সূক্ষ্মদর্শী লিখিতেছেন, 'নৃত্যকে যেন দেবীরূপে নূতন আলোকে মণ্ডিত দেখিলাম। ...এত রূপ, এমন পবিত্র নীরন্ধ্র সৌরভ, এমন হৃদয় আলোকরা বিমল জ্যোতি কোথায় কোন গভীর গহ্বরে আড়ালে পড়েছিল।'[২]

প্রভাতবাবু তাঁর এই লেখায় 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা'র মাথায় ১ চিহ্ন দিয়ে পাদটীকায় ওই ১ চিহ্নর জায়গায় লিখেছেন—১৩৩৩ চৈত্র ৩। ঋতুরঙ্গশালা। শান্তিনিকেতনে প্রথম অভিনয়।

প্রভাতবাবুর এই লেখায় দেখছি, তিনি একবার বলছেন—চৈত্র ৪ বা ১৮ মার্চ ঋতুরঙ্গশালা অভিনয় হয়েছিল, আবার বলছেন—চৈত্র ৩ বা ১৭ মার্চে অভিনয় হয়েছিল।

প্রভাতবাবু তাঁর লেখায় জনৈকা সূক্ষ্মদর্শী লিখিতেছেন বলে ঐ লেখিকার লেখা উদ্ধৃত করে উদ্ধৃতির শেষে লেখার মাথায় ২ চিহ্ন দিয়ে পাদটীকায় ওই ২ চিহ্ন প্রসঙ্গে লিখেছেন—সাহানা দেবী, নৃত্য : বিচিত্রা ১৩৩৪ আশ্বিন, পৃঃ ৫৬৫—৬৯।

প্রভাতবাবু এ প্রসঙ্গে পাদটীকায় আরও লিখেছেন—

১৩৩৪ আষাঢ়। বিচিত্রা ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা আষাঢ়, পৃঃ ৯—৭০। নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা (সচিত্র : নন্দলাল বসু-কৃত)।

১৩৩৪ অগ্রহায়ণ ২২। জোড়াসাঁকোর বাটিতে 'ঋতুরঙ্গ' নামে অভিনীত। ৪৪ পৃষ্ঠা পুস্তিকা।

১৩৩৪ পৌষ। মাসিক বসুমতী 'ঋতুরঙ্গ' নামে প্রকাশিত।

১৩৩৮ আশ্বিন। বনবাণী, পৃঃ ৪৩—১৩২। নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা বিচিত্রায় মুদ্রিত 'নটরাজ' ও মাসিক বসুমতীতে 'ঋতুরঙ্গ' একত্রীভূত ও পুনঃসজ্জিত হইয়া নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা নামে সংকলিত হয়। দ্র : রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, পৃঃ ১৯১—২৪৮। দ্র : গ্রন্থপরিচয় অংশ।

প্রভাতবাবু এখানে তাঁর লেখার শেষে দ্রঃ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, পৃঃ ১৯১—২৪৮ লিখলেও ওটা আসলে—রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃঃ ১৯১—২৪৮। ভুলক্রমে রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮-র জায়গায় রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫ হয়েছে।

এই অষ্টাদশ খণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীর নটরাজ বা নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা গ্রন্থের প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে এই গ্রন্থের ভূমিকা হিসাবে একটা ছোটো লেখা দেওয়া হয়েছে। তাতে রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই লিখেছেন—'নৃত্য, গীত ও আবৃত্তিযোগে 'নটরাজ' দোলপূর্ণিমার রাত্রে শান্তিনিকেতনে অভিনীত হইয়াছিল।' রবীন্দ্রনাথের এই লেখায় কিন্তু কোনো তারিখ কিংবা বারের উল্লেখ নেই।

পাঁজিতে আছে ৪ঠা চৈত্র বা ১৮ই মার্চ শুক্রবার ছিল দোল পূর্ণিমা। রবীন্দ্রনাথ ১৮ই তারিখের টেলিগ্রামে আগামীকাল শনিবার অভিনয় হবে বলায় পরিষ্কার জানা যাচ্ছে—৫ই চৈত্র বা ১৯শে মার্চ শনিবার অভিনয় হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ নটরাজ বা নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালার ভূমিকায় যে লিখেছেন—দোলপূর্ণিমার রাত্রে অভিনয় হয়েছিল, এটা ভুল।

আর প্রভাতবাবু একবার ৪ঠা মার্চ, আর একবার ৩রা মার্চ বললেও এর কোনোটাই ঠিক নয়। তবে তারিখের গোলমাল হলেও তিনি যে লিখেছেন—দোল পূর্ণিমার পরদিন অভিনয় হয়েছিল এটা ঠিক।

৫১

২৭ মার্চ ১৯২৭ শান্তিনিকেতন

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আমার অবস্থা তো দেখে গিয়েছিলেন—লোকজনের ভিড়ে, নানা গোলমালের মধ্যে। কোনোমতে তাড়াতাড়ি কয়েক লাইন লিখে যথাসময়ে পাঠাতে পেরেছিলুম এ আমার পক্ষে কম নয়। কিন্তু আমাকে আর কর্ম্মে জড়াবেন না—যে কর্ম্মের বন্ধন স্বেচ্ছায় পরেচি সেই আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়েচে—আর আমি একটুও পারব না। মালঞ্চের মালাকর হবার প্রার্থনা আমার দেবীকে একদিন জানিয়েছিলুম—তিনি রাজি আছেন জানি কিন্তু অন্য দেবতারাও খাটিয়ে নিতে ছাড়বেন না। বয়স যখন অল্প ছিল তখন সব দিক রক্ষা করার ভরসা ছিল—তাই উপরি কাজে বরঞ্চ আনন্দই পেতুম—একদিকে বিশ্বকর্ম্মা একদিকে বীণাপাণি উভয়েরই দরবারে সেলাম ঠুকেচি। এখন মন হরতাল করে বসেচে—বিশ্বকর্ম্মার কারখানা ঘরের দিক মাড়াতে চায় না, তা বিশ্ববাসীরা তাকে যতই ধিক্কার দিক্। এ দিকে আয়ু অল্প, শক্তি সম্বলও তলায় এসে

ঠেকেচে—এখন আমার কাছে যদি দাবী করতেই হয়, তবে যে অংশে কিছু রস বাকি আছে সেই অংশ—মরা গাঙে যে দিকে স্রোত বয় না সেদিকে নৌকো বার করবার জন্যে দোহাই পাড়বেন না। পাঁকের উপর দিয়েও লগি ঠেলা চলে কিন্তু সেটা নেহাৎ শাস্তি, মজুরী পোষায় না। আমি বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্মীদের কাউকে প্রণাম কাউকে আশীর্ব্বাদ করব কিন্তু আমার এ পার থেকে। ইতি ১৩ চৈত্র ১৩৩৩

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫২
২৬ নভেম্বর ১৯২৭

ওঁ

সুহৃদবরেষু

বিশ্ববৈদ্য সম্মিলনীতে অভিনয় করতে সম্মত হয়েছিলুম, প্রস্তুতও হচ্ছিলুম। এমন সময় সংবাদ পেলুম এ বৎসর কলকাতা বিশেষ ভাবে রোগে আক্রান্ত। এমন অবস্থায় অনেকগুলি ছেলে মেয়ে আশ্রম থেকে সেই রোগের হাওয়ায় নিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে উচিত হবে কিনা জানতে চাই। দায়িত্ব গুরুতর।

যাই হোক্ আমি কিছুদিনের মধ্যে কলকাতায় একবার দেখে শুনে বলে কয়ে আসব মনে করচি। তার উল্টো ঘটনা বোধ হয় অসম্ভব—অর্থাৎ এখানে আপনার আসা। ইতি ১০ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বন্ধুবর

কাল আমার অবস্থা আপনি তো স্বচক্ষে দেখে গেছেন। তার পরে রাত্রে বিছানায় শুয়েও ক্লান্তি কিছুতে ছাড়তে চায় না। — আজ সকালে উঠেও বোঝা ঘাড়ে চেপে আছে। পর্শুও এই দশা হয়েছিল। আমার মুস্কিল এই যে, বাইরে থেকে আমাকে দেখে আমার ভিতরকার ইন্‌সল্‌ভেন্সি ঠিক বোঝা যায় না। সবাই বলে, "আপনাকে তো বেশ সুস্থ দেখাচ্চে"—তার পরে নির্দ্দয়তা করতে তাদের আর সঙ্কোচ বোধ হয় না। এমনি করেই ক্রমশই আমার ক্ষতিটা এতটা জমে উঠেচে—ডেফিসিট পূরণ হতে না হতে ব্যয়ের অঙ্ক বেড়ে চলেচে। এমন কি, আমার বন্ধুরাও একথা বুঝেও বুঝতে চান না। তাঁদের প্রত্যেকের নিজের কাজ উদ্ধারের বেলায় আমার রিক্ত তহবিলে ভাগ বসাবার চেষ্টা করেন। রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে রোজই মনের ভিতর ছট্‌ফটানি আসে, ইচ্ছা করে সুদূরে পালাই—সেটা সহজ নয় বলে পেরে উঠিনে।

আপনি যদি কোনো কাগজে ছোট একটু চিঠিতে আপনি কাল যা দেখেচেন এবং অনুভব করেচেন সেটা লিখে সকলকে জানান আমার প্রতি কিছুমাত্র জুলুম না করতে, তাহলে আমি জোর পাই। আমার কালকের কুকীর্ত্তির নজির আমার বিরুদ্ধে যাবে—এর পূর্ব্বে যাঁদের দাবী আমি ঠেকিয়ে রেখেছিলুম তাঁরা আবার সচেতন হয়ে উঠ্‌বেন। বারবার অনুরোধ অস্বীকার করবার মতো মনের জোর আমার নেই বলেই এই দশা হয়েচে—সেই অভাবটা আপনি ডাক্তারের অধিকার খাটিয়ে পূরণ করে দেবেন। আজকাল এঘর থেকে ওঘরে যেতে কষ্ট হয়—থেকে থেকে পা ফুলে ওঠে—

এমন আধবাঁচা করে বাঁচতে আমার ধিক্কার বোধ হয়—ভয় হয় পাছে একদিন সম্পূর্ণ পরের উপর নিজের ভার চাপিয়ে সংসারের গলগ্রহ হয়ে জীবনটা কাটাতে হয়—তার মত অভিসম্পাৎ আর নেই। আপনার শরণাপন্ন হলুম। ইতি ৯ আগষ্ট ১৯২৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৪

বার্লিন

ওঁ

সাদর নমস্কার

ঘুরে ফিরে আপনার চিঠি কাল এসে পৌঁছেছে। আজ চলেছি মস্কৌ। আবার কিছুদিন পরে যেতে হবে আটলান্টিক পারে—তারপর পৌষ পার্ব্বণের দিন ফিরব দেশে।[1] আপাতত এই ত সঙ্কল্প। ঘুরপাক খেতে একটুও ভালো লাগে না, কিন্তু অদৃষ্ট ঘোরায়। মন যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে দেশে ফিরতে ইচ্ছা করে, কিন্তু দেশে ত শান্তি নেই। রোজই বুঝতে পারি কাজের বয়স গেছে—এখন কর্ম্ম প্রবাহিনীর ওপারে যাবার সময়—কিন্তু কাজের জের মিট্‌তে চায় না। তাই আপিসের ছুটির ঘণ্টা পড়লেও ওভার-টাইম কাজ করতে হয়। আজ কিন্তু আর সময় নেই—তল্পী বাঁধতে হবে, অতএব নমস্কার। ইতি ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. কবি এ বারের বিদেশ যাত্রা উপলক্ষে কলকাতা ত্যাগ করেন ১৯৩০-এর ২রা মার্চ। চেকোস্লোভাকিয়া, ইংলন্ড, জার্মানি, ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া ঘুরে আবার জার্মানিতে আসেন। সেখান থেকে যান রাশিয়ার মস্কোয়। রাশিয়া থেকে জার্মানি হয়ে যান আমেরিকায়। আমেরিকা থেকে ইংলন্ডে হয়ে দেশে ফেরেন ১৯৩২-এর জানুয়ারির শেষ দিকে।

৫৫ শান্তিনিকেতন

ওঁ

প্রীতিনমস্কার

নববর্ষের সাদর অভিবাদন। আমার স্মরণ শক্তির পরে যদি দাবী করেন, তবে হতাশ হবেন। কবে কোন্ সায়াহ্নে আমার কণ্ঠের কোন্ গুঞ্জনধ্বনি গীতমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেচে সে ইতিহাস উদ্ধার করা আমার পক্ষে অসাধ্য। ইতি ১লা বৈশাখ ১৩৩৮

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৬

গগনে গগনে নব নব দেশে রবি
নব প্রাতে জাগে নূতন জীবন লভি'।

২৫শে বৈশাখ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩৩৮

The same Sun is newly born
in new lands
in a ring of endless dawns.

May 6, 1931 Rabindranath Tagore
Shantiniketan

দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রর বাড়িতে তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি সংগ্রহ করতে গিয়ে সেই চিঠিগুলির মধ্যে উপরে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের বাংলা ও ইংরাজিতে লেখা ওই কার্ডটি পাই। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের ৭১তম জন্মদিন উপলক্ষে এটি ছাপা একটি কার্ড। কবির ভক্তরা কবিকে দিয়ে লিখিয়ে তখন তাঁর এই জন্মদিনের কার্ডটি করেছিলেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ডে লিখেছেন—'শান্তিনিকেতনে পঁচিশে বৈশাখ (১৩৩৮) রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্তি-উৎসব নিষ্পন্ন হইল। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র পরিচয় সভার উদ্যোগে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।'

আগে যেমন দেখেছি, শান্তিনিকেতনে ১৩৩৩ সালে Spring Festival দেখার জন্য রবীন্দ্রনাথ বন্ধু দ্বিজেন্দ্রনাথকে টেলিগ্রাফ করেছিলেন, এখানেও এমনও হতে পারে হয়ত রবীন্দ্রনাথই তাঁর জন্মোৎসবে যোগ দেবার জন্য বন্ধু দ্বিজেন্দ্রনাথকে ওই কার্ড পাঠিয়েছিলেন। না হলে জন্মোৎসব সভার উদ্যোক্তারাই দ্বিজেনবাবুর কাছে ওই কার্ড পাঠিয়েছিলেন। শেষেরটাই ঠিক বলে মনে হয়। যাই হোক্, এই কার্ডে রবীন্দ্রনাথের বাংলা লেখাটা প্রসঙ্গে একটা কথা মনে আসছে—

কলকাতার একটি অতি বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশন সংস্থা 'রবীন্দ্রনাথের একশো পঁচিশতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে' 'রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এতে রবীন্দ্রনাথের উপর ১২৫ জন কবির লেখা ১২৫টি কবিতা আছে। এই গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন—একজন নামকরা সাহিত্যিক।

আমার সংগ্রহে এই গ্রন্থ এক খণ্ড আছে। তাতে দেখছি—এই গ্রন্থের ৫১ পৃষ্ঠায় 'রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে' নামে প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কবিতা বলে এই কবিতাটি ছাপা হয়েছে—

গগনে গগনে নব নব দেশে রবি
নব প্রাতে জাগে নবীন জীবন লভি'।

দেখা যাচ্ছে, এই লেখা আগে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথেরই কবিতা। তবে এই লেখায়, নূতন জীবন লভি' হয়েছে—নবীন জীবন লভি'।

সংকলক কীভাবে এই কবিতা বিভূতিবাবুর কবিতা বলে সংগ্রহ করলেন, এ সম্বন্ধে আমার অনুমান—স্বাক্ষর সংগ্রহকারীরা যেমন নিজেদের অটোগ্রাফের খাতায় বিখ্যাত ব্যক্তিদের বাণী সংগ্রহ করে থাকেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে কোনো এক সময়ে কোনো স্বাক্ষর সংগ্রহকারী বিভূতিবাবুর কাছে কিছু লেখা চাইলে তিনি রবীন্দ্রনাথের ওই দু লাইন কবিতা (তাও কি নূতন-এর জায়গায় নবীন লিখেছিলেন?) লিখে নিজের নাম তারিখ দিয়েছিলেন। আর হয়ত বিভূতিবাবু তাঁর ওই লেখার মাথায় আগে পরে উদ্ধৃতির '' চিহ্নও দিয়েছিলেন।

'রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত' গ্রন্থের কবিতার সংকলক এ লেখা রবীন্দ্রনাথের লেখা না জেনে বিভূতিবাবুর লেখা বলে সংগ্রহ করেছিলেন।

তবে এটা ঠিক, এ কবিতা বিভূতিবাবুর লেখা নয়।

৫৭

ওঁ

প্রীতিভাজনেষু

নিমন্ত্রণটা ফাঁক দিতে ইচ্ছে তো হয় না। কিন্তু হিসেব করে দেখবেন ১৬ই কলকাতায় ফিরব—১৩ই শান্তিনিকেতনের ছুটি শেষ হয়েছে—দীর্ঘকাল কলকাতায় অপেক্ষা করার অপরাধ ও দুঃখ অসহ্য হবে, শান্তিনিকেতনে গিয়ে আবার ফিরে আসবার মতো নাড়ীর জোর নেই।

আমার বক্তব্য এই যে বরকন্যাকে নিয়ে আনন্দ করার পক্ষে শান্তিনিকেতন যেমন উপযুক্ত ক্ষেত্র এমন কলকাতা কখনোই নয়। চিন্তা করে দেখবেন।

আর একটা কথা, আপনার পত্রে জানলেম যে রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরার বিবাহ উপলক্ষ্যে একটা কবিতা লিখে পাঠিয়েছেন—এবং সেটা ছাপা হয়েচে—কিন্তু সংবাদটা সম্পূর্ণ সত্য কিনা সন্দেহ করি—ভাবীকালের প্রত্নতাত্ত্বিকেরাও এ বিষয়ে তর্ক তুলবে। কারণ, রবীন্দ্রনাথ কদাচ 'সোনা' শব্দের বানানকে মূর্দ্ধণ্যয়ে-র দ্বারা কণ্টকিত করেন না।[১] ইতি—১৫ই নভেম্বর ১৯৩১

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ডে

৭

লিখেছেন—'রবীন্দ্রনাথ (৩ নভেম্বর) তাঁহার সুহৃৎ ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের কন্যা ইন্দিরার বিবাহ উপলক্ষে কবিতা লিখিয়া দেন।'

এই কবিতা 'মিলন' (শ্রীমতী ইন্দিরা মৈত্রের বিবাহ উপলক্ষ্যে) নামে রবীন্দ্রনাথের 'পরিশেষ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই কবিতা রচনার স্থান কাল হিসাবে কবি কবিতার শেষে লিখেছিলেন—দার্জিলিং, ১৭ কার্তিক ১৩৩৮

দ্বিজেনবাবুর অনুরোধে কবি ইন্দিরার বিবাহের কিছুদিন আগেই কবিতাটি লিখে দিয়েছিলেন। দ্বিজেনবাবু কন্যার বিবাহ সভায় ওই কবিতা বিতরণের জন্য ছাপিয়েও ছিলেন। দ্বিজেনবাবু কন্যার বিবাহে রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাবার সময়, সেইসঙ্গে ছাপানো কবির এই কবিতাটি পাঠিয়েছিলেন। এই কবিতার এক জায়গায় 'সোনা' বানান 'সোণা' হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ ওই কথা লিখেছিলেন। কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল—

মিলন

শ্রীমতী ইন্দিরা মৈত্রের বিবাহ-উপলক্ষ্যে

সেদিন ঊষার নববীণাঝংকারে
মেঘে মেঘে ঝরে সোনার সুরের কণা।
ধেয়ে চলেছিলে কৈশোরপরপারে
পাখিদুটি উন্মনা।
দখিন বাতাসে উধাও ওড়ার বেগে
অজানার মায়া রক্তে উঠিল জেগে
স্বপ্নের ছায়া ঢাকা।
সুরভবনের মিলনমন্ত্র লেগে
কবে দুর্জনের পাখায় ঠেকিল পাখা।

কেটেছিল দিন আকাশে হৃদয় পাতি
মেঘের রঙেতে রাঙায়ে দোঁহার ডানা।
আছিলে দুজনে অপারে ওড়ার সাথী,
কোথাও ছিল না মানা।
দূর হতে এই ধরণীর ছবিখানি
দোঁহার নয়নে অমৃত দিয়েছে আনি—
পুষ্পিত শ্যামলতা।
চারিদিক হতে বিরাটের মহাবাণী
শুনালো দোঁহারে ভাষার-অতীত কথা।

মেঘলোকে সেই নীরব সম্মিলনী
বেদনা আনিল কী অনির্বচনীয়।
দোঁহার চিত্তে উচ্ছ্বসি উঠে ধ্বনি—
'প্রিয়, ওগো মোর প্রিয়।'
পাখার মিলন অসীমে দিয়েছে পাড়ি,
সুরের মিলনে সীমারূপ এল তারি,
এলে নামি ধরা-পানে।
কুলায়ে বসিলে অকূল শূন্য ছাড়ি,
পরানে পরানে গান মিলাইলে গানে।

দার্জিলিং
১৭ কার্তিক ১৩৩৮

৫৮

২৬ নভেম্বর ১৯৩১

ওঁ

প্রীতিভাজনেষু

স্ন্যাপ দুটোতে আনাড়ির পরিচয় আছে, গেল গেল করতে করতে উৎরিয়ে গেছে। ভালো লাগল।

কবিতাটাকে ভাষান্তর করবার শক্তি নেই—অতএব চেষ্টা না করাই সুবুদ্ধিসঙ্গত। ইতি ১০ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৯

Uttarayan
Santiniketan
Bengal.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

বিশ্বমানবিকতা ছাড়া আর কোনো নাম মনে আসচে না। ইতি। ১১ জানুয়ারি ১৯৩৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Dr. D.N. Maitra
4 Sambhunath Pandit Street
P.O. Elgin Road
Calcutta

৬০

House Boat
Padma

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার স্ত্রীকে স্নেহ করেছি, কতদিন আনন্দ পেয়েছি তাঁর আতিথ্য সম্ভোগ করে। সেদিন তিনি গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে, অনেকদিন পরে তাঁর প্রসন্ন হাস্যমুখ দেখেছিলেম—সে কথা মনে পড়চে। জীবনপূর্ণ স্মৃতিকে মৃত্যুর ভূমিকার উপরে দেখতে মন বাধা পায়, যদিও আমার বয়সে মৃত্যুর সত্য দূরবর্তী নয়, অবাস্তবও নয়।

তোমার সম্বন্ধে জনশ্রুতি মনের মধ্যে সঞ্চয় করে রাখবার দিন আমার আর নেই। জীবন নাট্যের লীলা বৈচিত্র্য যখন অত্যন্ত কাছে ছিল, তখন তার ঘাত প্রতিঘাত ছিল প্রবল। এখন পাদপ্রদীপের আলো নিবে আসচে—সেই শিখাগুলির ক্ষণিক আকর্ষণ থেকে বাহিরের তারার আলো আমাকে ডাকচে, অভিনয়ের পালা ভুলতে দেরি হবে না। কতো ভালো, কতো মন্দ ভেসে চলেচে রাত্রির মহাসমুদ্রের দিকে, পিছনে তার কোনো চিহ্ন থাকবে না। আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো। ইতি ২৭।২।৩৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬১

দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, টেলিগ্রাম প্রভৃতি যেমন পাওয়া যায়, তেমনি দ্বিজেনবাবুর অনুরোধে তাঁর অটোগ্রাফের খাতায় রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি কবিতাও পাওয়া গেছে। সেই কবিতাটি হ'ল—

লিখব তোমার রঙীন পাতায় কোন্ বারতা?
রঙের তুলি পাব কোথা?
সে রং ত নেই চোখের জলে, আছে কেবল হৃদয় তলে
প্রকাশ করি কিসের ছলে মনের কথা?
কইতে গেলে রইবে কি তার সরলতা?

বন্ধু তুমি বুঝবে কি মোর সহজ বলা?
নাই যে আমার ছলা-কলা।
সুর যা ছিল বাহির ত্যেজে অন্তরেতে উঠল বেজে,
একলা কেবল জানে সে যে মোর দেবতা।
কেমন করে করব বাহির মনের কথা?

১১ই আষাঢ়
১৩২১

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শান্তিনিকেতন
বোলপুর

মীরা চৌধুরীকে লিখিত

এই অংশে রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি মীরা চৌধুরীকে লেখা। মীরা দেবী ছিলেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা। তিনি রবীন্দ্রনাথের অন্যতমা স্নেহের পাত্রী ছিলেন।

মীরা দেবীর ডাক নাম ছিল বাবলি। রবীন্দ্রনাথ মীরা দেবীকে বাবলি বলেই ডাকতেন।

মীরা দেবীর স্বামী প্রফুল্লচন্দ্র চৌধুরী তখনকার অখণ্ড ভারতের একাউন্‌টেন্ট জেনারেল ছিলেন। মীরা দেবী তাঁর স্বামীর নিকট পেশোয়ারে থাকা কালে সেখানকার পীচ প্রভৃতি মেওয়া ফল রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। মীরা দেবীকে লেখা কয়েকটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের সেই সব পীচ প্রভৃতি ফল পাওয়ার কথাও আছে।

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়াসু

এতদিন, এ কয়দিন রেলগাড়ির পথ বেয়ে ফিরলুম, এমন এল পীচগুলি তোর সরস সুন্দর হাতে নিয়ে। ফলের সাথে দেখলুম তোর স্নেহ মাধুর্যের পরিচয়, তোমার শুশ্রূষার স্মৃতি। বিদেশী ফলের মধ্যে আমার সব চেয়ে ভালো লাগে পীচ, আর সব পীচের চেয়ে সেরা এই পেশোয়ারী পীচ, ভয় ছিল পাছে নষ্ট হয়ে থাকে। অবিকৃত অবস্থায় এসেছে। বক্স খোলবামাত্র লোভী বালকের মত একটা গিলেচি মুখে পুরে। বর্ষামঙ্গলের মহড়া চলচে — নিমন্ত্রণ রইল। ছুট করে চলে আয়, সাথে এক পার্সেল পীচ নিয়ে, আশীষ। স্নেহানুরক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মীরা চৌধুরীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির প্রতিলিপি

১.

"UTTARAYAN"

SANTINIKETAN, BENGAL.

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বাবলি, এ কয়দিন রেলগাড়ির পথ চেয়ে ছিলুম, আজ এসে পৌঁছল তোর সরস সুন্দর অর্ঘ্য নিয়ে। ফলের লাবণ্যে পেলুম তোর স্নেহ মাধুর্যের পরিচয়, তোর শুশ্রূষার স্মৃতি। বিদেশী ফলের মধ্যে আমার সব চেয়ে ভালো লাগে পীচ, আর সব পীচের চেয়ে সেরা এই পেশোয়ারি পীচ। ভয় ছিল পাছে নষ্ট হয়ে থাকে। অবিকৃত অবস্থায় এসেছে। বন্ধন খোলবা মাত্র লোভী বালকের মত একটা দিয়েছি মুখে পুরে। বর্ষামঙ্গলের মহড়া[১] চলচে—নিমন্ত্রণ রইল। ধাঁ করে চলে আয়, আর এক পার্সেল পিচ নিয়ে আসিস।

স্নেহানুরক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী ৪র্থ খণ্ড থেকে জানা যায়—১৩৪২ সাল থেকে শুরু করে ১৩৪৭ পর্যন্ত প্রতি বছরই বর্ষাঋতুতে বর্ষামঙ্গল উৎসব হয় শান্তিনিকেতনে। এবার কবির রচিত শেষ বর্ষা-সঙ্গীত 'এসো এসো ওগো শ্যামছায়া ঘন দিন।'

২.

"UTTARAYAN"

SANTINIKETAN, BENGAL.

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

এখান থেকে বিদায় নেবার সময় তুমি আমার সঙ্গে দেখা কর নি আমি এই নালিশ করি—তুমি নালিশ জানাচ্ছ আমি দেখা করিনি। ইতিহাসের এই গ্রন্থি কে মোচন করবে?

মায়ার খেলার নতুন গান রচনার ঘূর্ণি হাওয়ায় মন উড়ে বেড়াচ্চে[১]—সমাজ সংসারের কর্তব্য ক্ষেত্রে নেবে আসবার মতো অবকাশ নেই। তবু দু চার লাইন লিখে দিচ্চি, একটা নালিশ জমিয়ে রেখেছ পাছে আর একটা নালিশ বেড়ে যায় এই আমার আশঙ্কা, কিন্তু তাই বলে পেশোয়ারের নার্সিসস কুঞ্জবনে আমার দর্শন প্রত্যাশা কোরো না—জন্মেছিলুম ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে, অঙ্কটা কষে দেখো বয়স কত হোলো—তোমার বয়সের সঙ্গে অল্প একটু প্রভেদ আছে তার নিশ্চিত প্রমাণ পাবে। আশীর্বাদ জেনো। ইতি ১৬।১২।৩৮

শুভার্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য ছিল। কবি এবার 'মায়ার খেলা'কে নৃত্যনাট্যরূপ দান করেন। এজন্য নতুন গানও রচনা করেন।

৩.

"UTTARAYAN"

SANTINIKETAN, BENGAL.

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বাবলি, তুমি আমাকে যে মেওয়া পাঠিয়েছ তা যথাসময়ে পৌঁছিয়েছে এবং তার যথাযোগ্য ব্যবহার হচ্চে। দূর থেকে তোমার স্মৃতির প্রমাণ মাঝে মাঝে আমাকে পাঠাও সে খুব উপভোগ্য হয়। আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ২৭।১১।৩৯

স্নেহাসক্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪. "UTTARAYAN"

ওঁ SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়াসু

তোমার নামে আমার কাছে বাদাম পেস্তা যা কিছু এসেছিল, তাকে আমি আদর করে নিয়েছি এবং উপভোগ করচি। কিন্তু সে তোমার মনের মতো হয়নি বলেছ—সেটা আমার পক্ষে ভালো খবর। তোমার মনের মতো নৈবেদ্যের জন্যে অপেক্ষা করা যাবে। পেশোয়ারে যখন ফিরে আসবে তখন তোমার দ্বিতীয় সংস্করণ উপহার তুমি স্বহস্তে সাজিয়ে পাঠাতে পারবে। ইতিমধ্যে যা পাওয়া গেছে তাতে কাজ চলে যাচ্ছে।

আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো। ইতি ১০।১২।৩৯

স্নেহরত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫. "UTTARAYAN"

ওঁ SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়াসু

বাবলি বাদাম পেস্তা আখরোট সরগুজা তোর কল্যাণে প্রচুর এসেছে। বৎসরের আরম্ভে ভোগ আরম্ভ হোলো—আগামী নববর্ষের দিন আর একবার তাগিদ করা যাবে। মেওয়া যা এসেছে সেটা স্পৃহনীয় কিন্তু পেশোয়ার থেকে শীতের যে আমদানি হোলো তাতে শরীরটাকে কুণ্ঠিত করেছে। সূর্যদেব আরো একটুখানি তাপের বরাদ্দ করেন যদি তাহলে কাপড় চোপড়ের দলবাঁধা আক্রমণ থেকে রেহাই পাই। আমার আশীর্বাদ। ইতি ১৩।১।৪০

স্নেহরত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬.

"UTTARAYAN"

ওঁ

SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়াসু

বাবলি এতদিন পরে তোর পেশোয়ারের দয়া হয়েছে—হঠাৎ আজ অপ্রত্যাশিত ফল পাওয়া গেল। পিচগুলো একেবারে বাদশাহি চেহারার। স্বাদে গন্ধে তার আভিজাত্য প্রকাশ পায়। তাদের সঙ্গে পরিচয় কাল রাত্তির থেকেই শুরু হয়েছে।

এখানে আকাশ অত্যন্ত নির্মম। ধরণীর সঙ্গে যেন ঠাট্টা শুরু করেছে—মাঝে মাঝে বৃষ্টির ভঙ্গী করে—পৃথিবী যেই পাত পেড়ে বসে অমনি ভরা থালা নিয়ে দেয় দৌড়। রাগ ধরে অত্যন্ত কিন্তু কার উপরে রাগ করব ভেবে পাইনে। মাঝখানে একটা কোনো হিটলার যদি থাকত তাহলে তার কাছে হার মেনেও তাকে গাল দেওয়ার সুখ পাওয়া যেত। আমাদের বর্ষামঙ্গলের গান বাজনা তৈরি—বাসর ঘরের আসরে জ্বলবে বাতি, কিন্তু বর উপস্থিত নেই। ইতি ১১।৭।৪০

স্নেহাসক্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭.

"UTTARAYAN"

ওঁ

SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়াসু

বাবলি, আমি ছোট ঘর এবং দরাজ হৃদয় ভালোবাসি। সুতরাং তোমার আতিথ্যে আমার কোনো দিকে কিছু অকুলান হোত না। কিন্তু শরীর অপটু, এদিকে অক্সফোর্ড থেকে সম্মানের অর্ঘ্য[১] গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্চে। তারপরে সমস্ত শীতঋতু বৎসরের শেষ পর্যন্ত কর্তব্যজালে বদ্ধ থাকতে হবে।

তোমার আমন্ত্রণকে উল্টিয়ে নিলে কী রকম হয়? শান্তিনিকেতনে এসে তুমি অনায়াসে আমাকে অভ্যর্থনা করতে পার। শ্যামলীতে তুমি যদি আসন গ্রহণ করো তাহলে সেইখানেই আমি তোমার আতিথ্য গ্রহণ করতে পারব। সৌভাগ্যক্রমে যদি পেশোয়ার থেকে তোমার পীচ এসে পড়ে তাহলে তোমার হাত থেকে প্রত্যক্ষ তা গ্রহণ করতে পারব। এবারে পাহাড়ে ভাল ছিলুম না, শারীরিক দুঃখ ভোগ করেছিলুম। এখন অবস্থা ভালো।

বর্ষা এবার কৃপণ, এখানকার আকাশে মেঘ আছে, বৃষ্টি পাঠিয়েছে তোমাদের দিগন্তে। ইতি ২৮ আষাঢ় ১৩৪৭

স্নেহাসক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১. সাতই অগস্ট ১৯৪০ (বাইশে শ্রাবণ ১৩৪৭) শান্তিনিকেতনে সিংহসদনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ সমবেত হয়ে রবীন্দ্রনাথকে ডক্টর অব্ লিটারেচার বা সাহিত্যাচার্য উপাধি দান করেছিলেন।

৮.

মীরা চৌধুরীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি যেমন পাওয়া গেছে, তেমনি মীরা দেবীর অনুরোধে তাঁর অটোগ্রাফের খাতায় লেখা রবীন্দ্রনাথের কবিতাও পাওয়া গেছে।

এই কবিতা লেখার ইতিহাস হ'ল—১৯২৫ খৃস্টাব্দের জুন মাস। দেশবন্ধু তখন অসুস্থ হয়ে স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় দার্জিলিংয়ে বাস করছেন। ওই সময়ে মহাত্মা গান্ধী একদিন দেশবন্ধুর সঙ্গে দেখা করবার জন্য দার্জিলিংয়ে দেশবন্ধুর বাড়িতে এসেছেন। মীরা চৌধুরী সেই সময় দার্জিলিংয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন। দেশবন্ধু মীরা দেবীর দূর সম্পর্কের আত্মীয় হতেন। দেশবন্ধুর বাড়িতে গান্ধীজি

এসেছেন শুনে মীরা দেবীর খুব ইচ্ছা হ'ল, তাঁর অটোগ্রাফের খাতায় গান্ধীজিকে দিয়ে কিছু লিখিয়ে নেন। মীরা দেবী দেশবন্ধুর বাড়িতে গিয়ে দেশবন্ধুকে তাঁর মনের কথা বললে, তিনি আবার সেকথা গান্ধীজিকে বললেন। গান্ধীজি শুনে বললেন—ও যদি অন্তত ছ-মাস চরকায় নিয়মিত সুতো কাটবে ব'লে প্রতিজ্ঞা করে, তাহলে ওর খাতায় আমি কিছু লিখে দিতে পারি।

দেশবন্ধু গান্ধীজির কথা মীরা দেবীকে শোনালে তিনি সুতো কাটবেন বলে সম্মতি জানালেন। তখন গান্ধীজি মীরা দেবীর খাতা নিয়ে তাতে এই কথাগুলি লিখে দিলেন।

Never make a promise
in haste. Having once made
it fulfil it at the cost of
your life.

7.6.25

এই লিখে গান্ধীজি তাঁর মাতৃভাষা গুজরাটীতে নিজের নাম সহি করলেন।

এই ঘটনার কয়েক বছর পরে মীরা দেবী একবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে কিছুদিন সেখানে বাস করেছিলেন। সেই সময় তিনি তাঁর অটোগ্রাফের খাতায় রবীন্দ্রনাথকে কিছু লিখে দেবার জন্য তাঁর সেক্রেটারি অমিয় চক্রবর্তী মারফৎ অনুরোধ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন মীরা দেবীকে বলেছিলেন, তুমি তো এখানে আছ, খাতা রেখে যাও, কাল নিয়ে যেও।

মীরা দেবী খাতা রেখে এলে, রবীন্দ্রনাথ খাতা নিয়ে খাতার পাতা ওলটাতে ওলটাতে গান্ধীজির লেখাটা পড়লেন।

ওই লেখা পড়েই তিনি মীরা দেবীর খাতায় প্রথমে বাংলায় এই কবিতা, পরে ইংরাজিতে এই কথাগুলি লিখে দিয়েছিলেন,—

তোমারে করিবে বন্দী নিত্যকাল মৃত্তিকা শৃঙ্খলে
সাধ্য আছে কা'র!

সত্যের বন্ধন পরো, সে বন্ধন প্রেমমন্ত্র বলে
করো অলঙ্কার।
জীবন-বীণার তার অশিথিল শক্তি দিয়ে বাঁধো,
দিনেরাত্রে সুখে দুঃখে আলোয় আঁধারে তুমি সাধো
মৃত্যুহীন প্রাণের ঝঙ্কার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Surrender your pride to truth,
fling away your promise if it is found
to be wrong.

March 24, 1931 Rabindranath Tagore

সংশোধন

'জয়ন্তী উৎসর্গ' গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের লেখা প্রবন্ধের নাম 'রবীন্দ্র-সংস্পর্শে'। এই বইয়ে ঐ প্রবন্ধের নাম কোথাও 'রবীন্দ্র-সংস্পর্শে' কোথাও 'রবীন্দ্র সংসর্গে' ছাপা হয়েছে। ঐ 'রবীন্দ্র-সংসর্গে' হবে 'রবীন্দ্র-সংস্পর্শে'।